সাদা খাম

মতি নন্দী

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ   ১লা অগ্রহায়ণ ১৩৬৩

প্রকাশক ঃ   প্রবীর মিত্র ঃ   ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ঃ কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ঃ   গৌতম রায়

মুদ্রাকর ঃ শ্রীবাদলচন্দ্র পাল ঃ এস্ এম্ প্রিন্টিং ঃ ১৯ডি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়কে

সে আবার সামনের দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকাল তারপর নিজের হাত ঘড়িটায়, বহুদিনের অভ্যাস। ভুল সময় জানিয়ে তাকে ঠকাবে এমন ধারণা থেকে সে এটা করে না। অফিসের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়িটা তার মেলানই। প্রতিদিনই ছুটির সময় সে একবার মেলায়। পঁচিশ বছর আগে বিয়েতে পাওয়া ওমেগা ঘড়িটা এখনো এক মিনিটও স্লো বা ফাস্ট হয় না। তবুও। অফিসের ঘড়ি যদি আধ মিনিট ফাস্ট হয়, সেও তার ওমেগাকে আধ মিনিট ফাস্ট করে দেবে। নিজের ঘড়ির দিকে চোখ রেখে আসলে সে নিশ্চিত হতে চায় পরদিন অফিসে যেন লেট না হয়ে যায়। সময়ের *ঠেলাঠেলিতে* নিজের জায়গা থেকে সরে যায়নি, এই বোধটা তার কেন যে পাওয়া দরকার তা সে জানে না।

ছাব্বিশ বছরের এই চাকরিতে সে একদিনও দেরীতে পৌঁছয়নি। স্কুলেও সে তাই ছিল।

ক্লাসটাকে তিনভাগ করে যাতায়াতের দুটো সরু পথ। একটা পথের ধারে শেষ বেঞ্চে সে বসত আরো তিনজনের সঙ্গে। তার পাশেই বসত লম্বা, মোটাসোটা একটি ছেলে, নাম ছিল তিনকড়ি। ঠাকুমা মারা যাওয়ায় তিনদিন কামাই করে স্কুলে গিয়ে দেখে তিনকড়ি তার জায়গায় বসে। প্রথমে সে মৃদু প্রতিবাদ করেছিল। তাইতে তিনকড়ি বলে, "এটা কি তোর বাবার কেনা জায়গা ?" ক্লাসে মাস্টারমশাই আসতেই সে নালিশ জানায়। তিনকড়ি জায়গা ছেড়ে বসার সময় চাপা গলায় বলেছিল, "ছুটি হোক্, লাথি মেরে তোর বিচি ফাটাব।"

ছুটির ঘন্টা বাজার পরও সে ক্লাসে বসে থাকে। ক্লাস ফাঁকা হয়, স্কুলও ফাঁকা হয়, সে ভয়ে বেরোয় নি। ঘরের দরজা বন্ধ করতে এসে বেয়ারা তাকে দেখে অবাক হয়ে বলেছিল, "এখনো বসে।" সে স্কুল থেকে বেরিয়েছিল আরো একঘণ্টা পর, যখন গেটের কাছ থেকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বেয়ারা চেঁচাল, "কেউ নেই, এইবার বাড়ি যাও।" তবু সে তিনকড়ির ভয়ে প্রতিদিনের রাস্তা

দিয়ে না গিয়ে ঘুরপথে বাড়ি ফিরেছিল। পরদিন তিনকড়ি কখন তাকে লাথিটা ঠিক ওই জায়গাটায় মারবে সেই ভাবনায় সারা রাত তার ঘুম হয়নি। বছরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ কেন তিনকড়ির বেঞ্চের ধারে বসার ইচ্ছা হল, তাই নিয়েও সে ভাবে। অবশেষে সে সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, একটা মারাত্মক দুর্ঘটনায় পড়ে তিনকড়ির স্কুলে আসা বন্ধ না হলে তার বাঁচার আর কোন উপায় নেই। ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা জানিয়েছিল তিনকড়ির জন্য একটা ব্যবস্থা করার।

পরদিন সে ক্লাসে গিয়ে দেখল ছেলেদের একটা জটলা। তাকে দেখেই উত্তেজিত ভাবে একজন বলল, "প্রিয় তোর বিচিটা বেঁচে গেল। কাল তিনকড়ির একটা পা ট্রামে কাটা গেছে। কন্ডাক্টার টিকিট চাইতেই চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে পা পিছলে ট্রামের তলায়...।"

প্রিয়ব্রত আবার ঘড়ি দেখল। গত কুড়ি বছরে এই প্রথম ফণী পালের দেরী হচ্ছে। প্রত্যেক মাসের পয়লায়, মাইনের দিনে ঠিক সাড়ে চারটেয় ফণী আসে। তিনকড়ি আর কখনো স্কুলে আসেনি। সে কেন যে হঠাৎ বেঞ্চের ধারে বসতে চেয়েছিল আজও তা জানা হয়নি।

মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি, কখনোই আধময়লা বা ইস্ত্রি ছাড়া নয়। বোধহয় এখানে আসবে বলেই ফণী কাচানো ধুতিপাঞ্জাবির পাট ভাঙ্গে। মাথার সিঁথিকাটা চকচকে চুলের সঙ্গে যেন মানাবার জন্যই পরে কালো পাম্প শু। ফণীর বয়স কমপক্ষে পঁয়ষট্টি সুতরাং কলপ ছাড়া চুল অত কালো হবার কথা নয়। ফণী শৌখিন মানুষ। বাঁ হাতের তিন আঙুলে তিনটি আংটি। একটি তামার, একটিতে পলা এবং অন্যটিতে তিনরঙের পাথর।

তাহলে আজ আর বোধহয় আসবে না। তিনকড়ির মত ট্রামের তলায় বা ওইরকম কোন দুর্ঘটনায় যদি ফণীর পা কাটা যায় তা হলে কি হতে পারে? অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু আংটিগুলো কি গ্রহের ফের থেকে ওকে বাঁচাবে না? সেই জন্যই তো ওগুলো পরা। বছর দেড়েক আগে মোটা ছড়িটা হাতে নিয়ে প্রথমবার ফণী এসেছিল। রাস্তায় কুমড়োর খোসায় পা পড়ে পিছলে যায়। মুচকে গেছিল বাঁ পায়ের গোছ। "বুঝলে হে, এই ছড়িটা কেন নিয়েছি বলতে পার?" ফণী পাল ভ্রূ তুলে চোখ ছোট করে তাকিয়ে থেকে হাসছিল। "বলবে, পিছলে পড়া থেকে নিজেকে সামলাবার জন্য লাঠি নিয়েছি, তাই তো? আরে দেহের পতন কি লাঠিসাঠি দিয়ে রোধ করা যায়! এটা হাতে নিয়েছি পতনের কারণগুলোকে চলার পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্য! এই তো তোমার অফিসের দোড়গোড়ায় দেখলুম একটা এঁটো শালপাতা, সরিয়ে দিলুম

একধারে।"

ফণী পালের কথাগুলো শুনতে শুনতে সে প্রতি মাসের পয়লা তারিখে যেভাবে একটা সাদা খাম এগিয়ে দেয়, সেইভাবেই ড্রয়ার থেকে তুলে টেবলে ছড়ান তিনটি আংটির সামনে খাম রেখে দিয়েছিল। ফণী খামটাকে গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে উৎকণ্ঠিত স্বরে বলেছিল, "একটা কিছু ভরসা হাতে নিয়ে চলা খুব দরকার,...ভেরি ডেঞ্জারাস টাইম এখন, ভেরি ডেঞ্জারাস।"

মুখটা উদ্বিগ্ন রেখেই ফণী খামটা তুলে ভাঁজ করে পাঞ্জাবির বোতাম খুলে ভিতরের বুকপকেটে রাখল। প্রিয়ব্রত আড়চোখে তার বাঁদিকের চেয়ারে বসা দিলীপ ভৌমিককে চট করে একবার দেখে নেয়। ভৌমিক তাকিয়ে আছে ফণীর দিকে। অফিসের এই ঘরের সবাই জানে মাইনের দিনে এই লোকটা আসে একটা খাম নেবার জন্য। খামের মধ্যে টাকা থাকে। কত টাকা, সেটা আর কেউ জানে না। লোকটার নাকি খুবই অভাব।

মাসের পর মাস ঠিক এইভাবে ফণী বোতাম খোলে, খামটা ভাঁজ করে দুবারের চেষ্টায় পকেটে ঢোকায়। প্রিয়ব্রতর এটাই আশ্চর্য লাগে যে, কুড়ি বছর ধরে একই মাপের খাম সে দিচ্ছে আর একই মাপের পকেটওলা পাঞ্জাবি পরে ফণী আসছে। আর একইভাবে বাঁ হাতের দুটো আঙুল দিয়ে বোতামগুলো লাগিয়ে নিয়েই বলবে, "এবার এক গ্লাস জল খাওয়াও।"

প্রিয়ব্রত আগে ব্যস্ত হয়ে চেঁচিয়ে জল দিয়ে যাবার জন্য বেয়ারাকে বলত। মাস চারেক পর তার মনে হয় এজন্য ফণী মিনিট দুই সময় যেন বেশি পেয়ে যাচ্ছে তার সামনে বসে থাকার। খামটা ওর হাতে তুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে অনুভব করত তার মধ্যে একটা হিংস্র ইচ্ছা গজরে ওঠে। টেবলের ওপর দিয়ে লাফিয়ে পাঞ্জাবিটা ফালাফালা করে দেবার ইচ্ছা। এইটুকুই মাত্র। তাই সে ফণী আসার আগেই এক গ্লাস জল আনিয়ে টেবলে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে শুরু করে। ফণী জল চাওয়ামাত্র গ্লাসটা সে এগিয়ে দেয়। এরপর ফণী আর জল চাইত না, নিজেই ঢাকনা তুলে গ্লাস টেনে নেয়। জল খেয়ে বলে, "এখন তো তুমি বেরোবে না, আমি তাহলে এগোই।"

প্রিয়ব্রত জলভরা গ্লাসটার দিকে তাকাল। ওটা এইভাবেই রয়ে যাবে, নাকি সে খেয়ে নেবে? নির্দিষ্ট ছন্দের মধ্যে আজই প্রথম বেতাল একটা ব্যাপার ঘটায় সে অস্বস্তিতে পড়ে যাচ্ছে। ফণী পাল কি আজ আসবে না? জলটা কি সে খেয়ে নেবে?

"আপনার দাদা এলেন না যে?"

"তাই তো ভাবছি, বুড়োমানুষ। কিছু হলটল নাকি ?"

প্রিয়ব্রত চিন্তা নিয়ে ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে রইল।

"উনি তো ঘড়ি ধরে ঠিক এই সময়ে আসেন। একবার খোঁজ নিন। কোনদিকে থাকেন উনি ?"

"আমাদের দিকেই।"

"তাহলে বাড়ি ফেরার পথে একবার ঘুরে যান।"

স্বদেশ সরকার এসে ভৌমিকের টেবিলে দুহাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল। প্রিয়ব্রত তখন ভাবছে খামটা ড্রয়ারেই রেখে যাবে না সঙ্গে নিয়ে বাড়ি যাবে ! ড্রয়ার চাবি দেওয়া থাকে, তাছাড়া খামটা সবার অলক্ষ্যেই রাখবে। তাহলে তালাভাঙ্গার প্রশ্নই ওঠে না। ছাব্বিশ বছরে মাত্র একবার সে ছাতা ফেলে গেছিল, পরদিন এসেই সেটা পেয়ে যায়। বেয়ারা সতীন তুলে রাখে। মিষ্টি খেতে ওকে একটা টাকা দিয়েছিল। চারবছর আগে সে রিটায়ার করে গেছে। কিন্তু সবাই তো আর সতীন নয় !

খামটা পকেটে করে বাড়িতে যাওয়াও নিরাপদ নয়। মৌলালি থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত শেয়ালদার এই অঞ্চলটায় বাসগুলোতে পকেটমার থাকবেই। গত মাসের মাঝামাঝি সে তার বয়সীই একজনকে বাসের মধ্যে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠতে দেখেছে। মহাজনকে দেবার জন্য চার হাজার টাকা তার হাতের ছোট্ট ব্যাগটায় ছিল।

"আর কাউকে অ্যাটেম্পট্ না করে ওর ব্যাগটাকেই টার্গেট করল, তার মানে জানত !" প্রিয়ব্রতর পাশের লোকটি বলেছিল।

"এত টাকা সঙ্গে থাকলে তার সাবধান হওয়া উচিত ছিল।" আর একজন প্রিয়ব্রতকে ফিসফিস করে শোনায়।

খোলা ড্রয়ারে খামটা রাখার সময় সে আড়চোখে তাকাল। ওরা দুজন নিজেদের মধ্যে কথা বলছে।

"তাহলে পারলেন না। আপনি হচ্ছেন ইলেভেনথ, এবার দেখি অতুলদা টুয়েলফথ্ হন কিনা।"

প্রিয়ব্রত ড্রয়ার বন্ধ করে গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসল।

"ভৌমিকদা পারলেন না বলতে।" স্বদেশ টেবিলে দু হাত রেখে একই ভঙ্গিতে ঝুঁকে দাঁড়াল। "অতুলদা এবার আপনার পালা। বাবর হল প্রথম মোগল বাদশা তাহলে বাহাদুর শা জাফর কততম মোগল বাদশা ?"

"হঠাৎ এমন বেয়াড়া প্রশ্ন ?" প্রিয়ব্রতর স্বরে কোন ঔৎসুক্য নেই।

"কারণ আছে, পরে বলছি। খুবই কঠিন প্রশ্ন। বাহাদুর শা-র নাম নিশ্চয় শুনেছেন্। আঠারশো সাঁইত্রিশ সালে তেষট্টি বছর বয়সে দিল্লির মসনদে বসে কুড়ি বছর রাজত্ব করেছিল। তারপর সিপাই বিদ্রোহের সময় ইংরেজরা ওকে বৌ-ছেলেসমেত ধরে রেঙ্গুনে চালান করে দেয়। ওরই দরবারে ছিল মির্জা গালিব, যার নামে এখন ফ্রি স্কুল স্ট্রিট। যাক গে, ওসব কথা, এখন বলুন বাহাদুর শা কততম মোগল বাদশা ?"

"জানি না।"

"বলেছি তো কঠিন প্রশ্ন।" স্বদেশের মুখ জ্বলজ্বলে হয়ে উঠল। কঠিন প্রশ্ন যারা করে তারা যে খুব সাধারণ বুদ্ধির লোক নয় এটা সে সবাইকে জানাতে চেষ্টা করে।

"বাহাদুর শা-কে নিয়ে এখন মাথা ঘামাবার কোন দরকার আছে কি ?" ভৌমিক দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকিয়েই ছড়ানো চিঠি আর মেমো আঁটিতে শুরু করল পিন দিয়ে।

"দরকার নেই মানে ? তিনশো বছরেরও ওপর ভারতে রাজত্ব করল যারা সেই বংশের শেষ বাদশার কোন গুরুত্ব নেই ? কি বলছেন ভৌমিকদা ! জানেন মোগল বংশের শেষ পুরুষ মানুষটি, বাহাদুর শা'র পুতি মানে নাতির ছেলে, নীলরতন সরকার হাসপাতালের ফ্রি বেডে মারা গেছে উনিশশো আশিতে ?"

"কে বলল তোমায় ?" ভৌমিক ঈষৎ কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল। স্বদেশের মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল।

"জানতে হয়, বুঝলেন খবর রাখতে হয়। এই লাস্ট মুঘলের নাম হল প্রিন্স বেদার বখ্ত, অফিসিয়ালি রেকগনাইজড লাস্ট মুঘল মেল ডিসেনডেন্ট। ইন্ডিয়া গাবমেন্ট মাসে আড়াইশো টাকা পেনসন দিত। ওর পাঁচটি মেয়ে, কোন ছেলে নেই। অতএব মোগল বংশ নীলরতনের ফ্রি বেডেই খতম।" স্বদেশের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে এই তথ্যটি জানাবার জন্যই এতক্ষণ সে ভূমিকা ফাঁদছিল।

"বুঝলেন অতুলদা," ভৌমিক ফাইলের দিকে তাকিয়ে ফিতে বাঁধার কাজে ব্যস্ত থেকেই বলল, "যত রাজ্যের লুকোন খবর, হাঁড়ির খবর, গোপন ব্যাপার জানার জন্য স্বদেশের এই আগ্রহটা কিন্তু একদমই ভাল নয়। এরপর কোনদিন হয়তো এসে বলবে, "আচ্ছা বলুন তো আমাদের অফিসে কারা কারা বয়স কমিয়ে চাকরি করছে ?" ... ডেঞ্জারাস লোক এই স্বদেশ সরকার।"

ভৌমিক বা স্বদেশ যদি লক্ষ্য করত তাহলে দেখতে পেত প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে সেখানে মৃতের পাণ্ডুরতা।

"আমি ডেঞ্জারাস লোক! দুঃখ দিলেন ভৌমিকদা, আমায় আপনি দুঃখ দিলেন। পৃথিবীতে কোন লোকের না গোপন ব্যাপার আছে বলুন? আমার আছে, আপনার আছে, অতুলদারও আছে। ঠিক বলছি কিনা?" স্বদেশ সমর্থনের আশায় প্রিয়ব্রতর দিকে তাকাল।

ঠোঁটটা টেনে রেখে সে শুধু ফিকে হাসল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতেও পারল তার হাসিটা যথাযথই হয়েছে। কথা না বললে যে লোক কথা বলে না, তার কাছ থেকে এইটুকুর বেশি হাসি আশা করা যায় না। কিন্তু সে জানে এইটুকু হাসার জন্যও তাকে চেষ্টা করতে হয়েছে। স্বদেশের "অতুলদারও আছে" কথাটা তার মস্তিষ্কের গভীর জায়গায় হাতুড়ির দুটো ঘা মেরে অসাড় করে দিয়েছে।

স্বদেশ কথাটা কেন বলল? ও কি কিছু আন্দাজ করেছে? ফণী পাল আজ আর এল না। ওর সঙ্গে কি স্বদেশের পরিচয় আছে? কখনো কি দুজনকে কথা বলতে দেখেছি বা চোখাচোখি হলে পরিচিতের হাসি? ফণীকে সে অফিসের কারুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়নি। তবে সবাই দেখেছে একটা লোক প্রতি মাসে মাইনের দিন আসে, তার সামনে বসে; একটা সাদা খাম নিয়ে চলে যায়। মাসের পর মাস, কুড়ি বছর ধরে। ফণী পালের ব্যাপারটা চোখে পড়া স্বাভাবিকই। এই ঘরে কুড়ি বছরের বেশি কাল চাকরি, তাকে বাদ দিলে আর মাত্র দুজন করছে। ভৌমিকের ষোল বছর, স্বদেশের সাত বছর চাকরির বয়স।

প্রিয়ব্রত ড্রয়ারে চাবি ঘোরাল। টেনে দেখল, তালাবন্ধ হয়েছে কিনা। দেয়াল ঘড়ি দেখল। পাঁচটা বাজতে পাঁচ।

"উঠলেন নাকি অতুলদা?" স্বদেশ বলল।

"হ্যাঁ, আজ একটু তাড়াতাড়ি...।" দুটো ফাইল হাতে প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। চেয়ারের পিছনে স্টিল আলমারিতে সে দুটো রেখে পাল্লা বন্ধ করে চাবি দিল।

"অতুলদার কাছে ওর এক জ্ঞাতি দাদা প্রতি মাসের পয়লায় আসেন টাকা নিতে... সাহায্য। আজ আসেননি, তাইতে দাদার মন খুব ডিস্টার্বড, স্বাভাবিকই।"

ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে প্রিয়ব্রত হাসার চেষ্টা করল। স্বদেশের চোখে নম্র ছায়া; শ্রদ্ধার মত। গোপন ব্যাপার জানার জন্য কৌতূহল লুকিয়ে আছে ওই চোখের আড়ালে। সে আলমারির হাতল টানল চাবি বন্ধ হয়েছে কিনা জানার জন্য।

সেকশানাল ম্যানেজার সজল দত্তর টেবিলে থাকে হাজিরা খাতা। পাঁচ মিনিট আগে সই করলে কিছু বলবে না। কিন্তু এটা সে মনে করে রেখে দেবে। প্রিয়ব্রত

চায় না কোনভাবে কেউ অফিসে তাকে মনে রাখুক। একটা ধূসর ছায়ার মত সে ছাব্বিশ বছর এই অফিসে থেকেছে, রিটায়ার করা পর্যন্ত তাই থেকে যেতে চায়।

ঘরের বাইরে বারান্দা। তারপর একটু খোলা পাঁচিলঘেরা জমি, লোহার ফটক। উত্তরবঙ্গের এক বড় জমিদারের আবাস ছিল এই বাড়িটা। অফিস হবার মত আকৃতি বা অবস্থান ঘরগুলোর নয়। দোতলা আর তিনতলার বড় দালান ঘরদুটোয় কাঠের পার্টিশান দিয়ে কয়েকটা খোপ, অফিসাররা বসে। ময়লা পর্দা ঝোলে সেগুলোর দরজায়।

এই খোপগুলোরই একপ্রান্তে ঘরের কোণায় পাশাপাশি দুটো টেবিলে বসে প্রিয়ব্রত আর ভৌমিক। পার্টিশান না থাকলেও ঘরের মতই জায়গাটা। মেঘলা দিনে টেবল ল্যাম্প জ্বালিয়ে কাজ করতে হয়। মোটা দেয়ালের জন্য গরমের দিন ভিতরটা ঠাণ্ডা থাকে। চার তলার ছাদেও অ্যাসবেস্টস চালা দিয়ে হাল্কা গাঁথুনির কয়েকটা ঘব করে নেওয়া হয়েছে।

তিনতলার সিঁড়ির চওড়া ল্যান্ডিংয়ে ছোট একটা টেবিলে শ্যামসুন্দরের ক্যান্টিন। তোলা উনুনে চা, ওমলেট তৈরী হয়। পাঁউরুটি আর বাড়ির তৈরী ঘুগনিও পাওয়া যায়। একটা বাচ্চা টেবিল ঘুরে ঘুরে খাবার, চা দিয়ে আসে। ময়লা একটা খাতায় শ্যামসুন্দর ধারের হিসাব রাখে। প্রিয়ব্রত গত মাসের জন্য তিপ্পান্ন টাকা আজই ওকে দিয়েছে।

বারান্দায় এসেই আকাশে তার চোখ পড়ল। ফটকের দুধারে চারটে পাম গাছ। তার উপরে ঘোমটার মত আকাশে বিছিয়ে রয়েছে ঘন কালো মেঘ। কখন যে জমেছে ভিতরে বসে সে টের পায়নি। অবাক হয়ে সে তাকিয়ে রইল। গত চারদিন কলকাতার তাপ সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ ডিগ্রির মধ্যে রয়েছে। দুপুরটায় অফিসের ভিতরে থাকার জন্য সে বুঝতে পারে না বাইরে রোদের তাত কতটা কষ্টকর। বইরে থেকে যারা ঘুরে আসে শুধু তাদের মুখেই শুনতে পায় কি অসহ্য হয়ে উঠেছে গরমটা।

ভৌমিক বলেছিল, "এসব হচ্ছে আদিখ্যিতে। গরমদেশের মানুষের মুখে গরম নিয়ে কমপ্লেন মানায় না।" কথাটা ঠিক। বাসে ফেরার সময় ভ্যাপসা গুমোটে নির্বিকার গাদাগাদির মধ্যে একটা লোকও গরম নিয়ে অভিযোগ তোলে না। থুতনি থেকে কনুই থেকে ঘাম ঝরে পড়ে সীটে বসা লোকের কপালে বা হাতে। তারা রেগে ওঠে না শুধু কাঁচুমাচু হওয়া মুখের দিকে কড়া চোখে একবার তাকিয়ে বিড়বিড় করে ঘামের ফোঁটা মুছে নেয়।

বারান্দার পাঁচিলে হাত রেখেই প্রিয়ব্রত তুলে নিল। রোদ সরে গেছে কিন্তু এখনো জুড়োয় নি। আকাশের এদিকটা ফিকে নীল, রোদ্দুরও রয়েছে। কিন্তু ওই ঘন মেঘটা গুটিগুটি এগিয়ে আসবে। বছরের প্রথম কালবৈশাখী আজ এলেও আসতে পারে। তাড়াতাড়ি বাস ধরতে পারলে অন্তত হাতিবাগান পর্যন্ত কিংবা মানিকতলা অবধি বৃষ্টিকে পিছনে ফেলে রাখা যাবে। ফণী পালের খবর আজ আর বোধহয় নেওয়া যাবে না।

অফিস থেকে বেরিয়ে প্রিয়ব্রত দ্রুত হাঁটতে শুরু করল। শেয়ালদায় প্রাচী সিনেমার স্টপে বাস থেকে অনেক লোক নামে ট্রেন ধরতে। ওইখান থেকে বাসে ওঠার সময় ধাক্কাধাক্কি করতে হয় না, দাঁড়াবার জন্য একটু ভাল জায়গাও ভিতর দিকে পাওয়া যায়, তাছাড়া ওখান থেকে বাসে উঠলে শ্যামবাজার পর্যন্ত ভাড়া পঞ্চাশ পয়সা। অফিস থেকে এই বাস স্টপে পৌঁছতে প্রিয়ব্রতকে জোরে বারো মিনিট হাঁটতে হয়। ঘড়িতে সে সময় নিয়ে দেখেছে।

মৌলালির মোড়ে তাকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। পূর্ব-পশ্চিম ট্র্যাফিক চলাচল হচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণ এখন থেমে রয়েছে। সে যাবে উত্তরে। পেভমেন্ট থেকে রাস্তায় নেমে আবার উঠে এল। হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাতাস দমক দিয়ে মৌলালির মোড়ের গাছগুলোর পাতা ঝাঁকিয়ে দিল। পথচারীরা চমকে উঠেই মুখে ছড়িয়ে দিল তৃপ্তির হাসি। প্রিয়ব্রতব মত অনেকেই আকাশের দিকে তাকাল। রোদ নেই শুধু একটা ছাই রঙের আলো যাতে কোনকিছুরই ছায়া পড়ে না।

এই সময় তার নজরে পড়ল ওই দুজন। রাস্তা পার হবার জন্য ওরাও অপেক্ষা করছে। বাপ আর মেয়ে। খুদিকেলো, আর··· কিন্তু মেয়েটির নাম সে জানে না। তিরু বা নিরু বা অরু, এর মধ্যেই একটা কোন নাম হবে। এই নামগুলোই তার কানে মাঝেমাঝে আসে যখন সে ছাদে থাকে। খুদিকেলোর পাঁচ মেয়ে।

আবার একটা দমকা বাতাস। রাস্তায় পড়ে থাকা শুকনো পাতা, কাগজ উড়িয়ে ধুলোর ঝড় উঠল। কুঁজো হয়ে বাতাসের বিরুদ্ধে পিঠ ফিরিয়ে প্রিয়ব্রত চোখ বন্ধ করল। চুলের মধ্যে ধুলো ঢুকছে, ঘাড়ে আর হাতের অনাবৃত অংশে ধুলোর ঝাপটায় চামড়া চিড়বিড় করে উঠল। টিনের চালা বা দোকানের সাইনবোর্ড এই রকম ঝড়েই উড়ে আসে। প্রিয়ব্রত দ্রুত পা চালিয়ে একটা লেদ মেসিন দোকানের দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। আঙুল ঢুকিয়ে চুল ঠিক করতে করতে দেখল তার পাশেই খুদি কেলো এবং তার মেয়ে।

প্রিয়ব্রত ওর দিকে তাকিয়ে চোখ দিয়ে অনিশ্চিতভাবে হাসল। অন্তত পঁচিশ

বা তিরিশ বছর তারা কথা বলেনি, যদিও কৈশোর পর্যন্ত একসঙ্গে খেলা করেছে।

তাদের বাড়িও পিঠোপিঠি। দুই বাড়িরই খিড়কি দরজা খুললে চারফুট চওড়া আর প্রায় চল্লিশ গজ লম্বা বেলে পাথরের একটা পগাড। তার দুধারে গোটা বারো বাড়ির খিড়কি। যখন খাটা পায়খানা ছিল তখন এই পগাড় দিয়েই মেথররা পরিষ্কারের কাজ করত। প্রিয়ব্রত অবশ্য খাটা পায়খানা দেখেনি। ছোটবেলায় চোর-পুলিশ খেলার সময় পগাড়টা ছেলেদের কাজে লাগত। তখন সে একটা বাড়ির দেয়ালে ঢালাই লোহায় লেখা 'সিউয়ার্ড ডিচ' কথাটা আঁটা দেখেছিল। একটা গ্যাসবাতি ছিল তাদেরই খিড়কি দরজার উপর।

পাড়াটার একপ্রান্ত পড়েছে কালীমোহন মিত্র স্ট্রিটে, আর একপ্রান্ত গুপী বসাক লেনে। মলমূত্র এবং বাড়ি থেকে ফেলা আবর্জনা মাড়িয়ে ও ডিঙ্গিয়ে চোর-পুলিশ খেলতে খেলতেই প্রিয়ব্রত প্রথম দেখেছিল শুকনো রক্তমাখা ভাঁজ করা পুঁটলি। তার সঙ্গে ছিল খুদিকেলো। ছুটতে ছুটতেই প্রিয়ব্রত জিজ্ঞেস করেছিল, "ওটা কি বল তো ?" "আর জোরে ছোট্, বাঁয়ে গুপী বসাক দিয়ে চলে যা আমি সোজা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ দিয়ে ঘুরে যাব·· ওটা হল মেয়েদের ন্যাকড়া, প্রত্যেক মাসে হয়।"

ক্লাস সেভেনে পড়া প্রিয়ব্রত চমৎকৃত হয়েছিল। তারই বয়সী অথচ তার থেকে কত বেশি জানে! শ্যামবর্ণ, মিষ্টি মুখ, ভাল স্বাস্থ্য, সমবয়সীদের থেকে সামান্য বেঁটে এবং মুখ খারাপ করা খুদিকেলো কর্পোরেশন স্কুলে তিন বছর কাটিয়ে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল। কাবাডি খেলত দারুণ। ওর রেইড করাটা দেখার মত ব্যাপাব ছিল। একই সঙ্গে হাত ছুঁড়ে আর পিছনে পা তুলে মারত। সাপের ছোবলের মত আর ঘোড়ার লাথির মত! মেরেই আঙুল দিয়ে মোড় হওয়াদের দেখাতে দেখাতে ফিরে আসত নিজের কোর্টে। প্রিয়ব্রত এটা নকল করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হাত আর পা, একই সঙ্গে অত দ্রুত গতিতে সে মেলাতে পারত না। খুদিকেলো গলিতে ক্যাম্বিস বলে ফুটবল খেলাতেও ছিল দুর্ধর্ষ। দেওয়ালে বল মেরে রিবাউন্ড-এ সেই বল ধরায় ওর জুড়ি ছিল না। এইভাবে পরপর চারজনকে কাটিয়ে সে বহু গোল করেছে। প্রিয়ব্রত এটাও নকল করতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। অনেক পাড়ার টিমই খুদিকেলোকে হায়ার করে নিয়ে খেলত। তবে দেওয়াল না পেলে কানা হয়ে যেত ওর গোল করার ক্ষমতা। বড় বল নিয়ে খোলা মাঠে সে কখনো খেলেনি।

খুদিকেলোর ভাল নাম যে শিবপ্রসাদ দাস এটা প্রিয়ব্রত জানতে পারে পাড়ার

দুর্গাপুজোর বার্ষিক বিবরণ ও চাঁদাদাতাদের নামের বই থেকে। স্বেচ্ছাসেবকদেব নামের তালিকায় প্রিয়ব্রতর নামের পরেই ছিল ওই নামটা। এই নামে পাড়ায় কে আছে জানার জন্য সে জ্যাঠতুতো সেজদাকে জিজ্ঞাসা করেছিল। সেজদা ছিল সার্বজনীন পুজোর যুগ্ম সহ-সম্পাদক। 'ও তো খুদিকেলো' শুনে প্রিয়ব্রত অবাক হয়ে যায়।

এখন মৌলালির মোড়ে দমকা বাতাসে ওড়া ধুলোর ঝাপটার মধ্যে হঠাৎ খুদিকেলোকে গা ঘেঁষে দাঁড়ান দেখে প্রিয়ব্রত পঁযত্রিশ বছর আগে অবাক হওয়ার স্বাদটা পেল।

সে বলতে চাইল 'কেমন আছিস ?' কিন্তু তুই না তুমি, কোনটা দিযে সম্বোধন করা উচিত ঠিক করতে না পেরে বলল, "কোত্থেকে ?"

খুদিকেলোও যেন দ্বিধায পড়ল। চোখ নামিযে বলল, "এই এখানেই -- মামার কাছে।"

"এখন কি বাড়িব দিকে ?"

ওকে তো তুইই বলতাম !

"হ্যাঁ।"

"আমিও।"

এত বছর কথা না বলায় অপরিচিতের মত লাগছে। তুই বলাটা কি ঠিক হবে ? অবশ্য ও তাতে কিছু মনে করবে না।

তাবা রাস্তার দিকে তাকাল। আরো কিছু লোক দোকানের দরজার সামনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। বড় বড় বৃষ্টিব ফোঁটায় পেভমেন্টে পটপট শব্দ উঠছে। হাওয়ায বৃষ্টির ঝাপটা দোকানের দিকে দু-তিনবার ঘুরে আসতেই দাঁড়ান মানুষগুলো ঘন হয়ে সরে এল। কয়েকজন উঠে পড়ল দবজাব ধাপে। রাস্তার ওপারের বাড়িটাব তিনতলায় একটা হলুদ সাইনবোর্ড দড়িতে ঝুলছে আর দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে।

খুদিকেলোর গায়ের সঙ্গে গা লাগছে। প্রিয়ব্রত ঘাম আর নারকোল তেলের গন্ধ পেল। জামার কলারেব ভিতরে ময়লা, ঘাড়ে পাকা চুল, চাঁদিতে টাক, গলার চামড়া ঢিলে, কোঁচকান। ওকে একটা ছোট দর্জির দোকানে কাজ করতে দেখেছে। দোকানটা ওরই।

পূর্ব-পশ্চিম ট্র্যাফিক এখন বন্ধ। অপেক্ষমান গাড়িগুলোর ফাঁক দিয়ে ধর্মতলা স্ট্রিটটা পার হওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি লাভ। বাসে ওঠার আগেই কাকভেজা হয়ে যেতে হবে। এখন কোথাও আচ্ছাদনের নীচে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যাবে

না।

"গরমটা এবার কমবে।"

খুদিকেলো তাকেই বলল। প্রিয়ব্রতও কথা বলতে চায়। বহু বছর ছোটবেলার কোন বন্ধুর সঙ্গে সে কথা বলেনি।

"আজকের মত কমবে, তারপর যে কে সেই। লাভের মধ্যে এখন বাসে ওঠা শক্ত হয়ে পড়ল।"

"এ বৃষ্টি বেশিক্ষণ থাকবে না। যা বাতাস, মেঘটেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাবে।"

প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়ে কথা বলছিল। মেয়েটির চোখ আধবোজা। বৃষ্টির কণা বাতাসে উড়ে মুখে লাগছে। তাতে চামড়ায় যে শিরশিরে ভাব জাগে বোধহয় সেটাই উপভোগ করছে। গালের ঠিক মাঝে ছোট্ট একটা তিল। নাকটা লম্বা, শক্ত চৌকো চোয়াল। চাপা থুতনি। মাথায় বাপেরই সমান। খুদিকেলো রীতিমত বেঁটেই।

"এটা ঠিক কালবোশেখি নয়।"

প্রিয়ব্রত খবরের কাগজে হেডিংটা শুধু দেখে বাজারে বেরিয়ে গেছিল। তারপর আর কাগজ পড়া হয়নি। রোজই তাই হয়, অফিস থেকে ফিরে এসে পড়ে। তার ছেলে হিতব্রত 'দা মেইল' ইংরিজি খবরের কাগজের রিপোর্টার। ওই কাগজটাই সে পড়ে।

মেয়েটি আড়চোখে তাকাতেই তার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। মুখ ফিরিয়ে নিল। চোখের মণিটা বেশ বড় আর ধূসর। ওর কাছে একদম অপরিচিত সে নয়। প্রিয়ব্রতর তিনতলার ঘরের জানলা বা ছাদ থেকে খুদিকেলোর দোতলা বাড়ির ছাদের সবটাই দেখা যায়। মেয়েটিকে সে ছাদে বছর দশেক আগেও এক্কা-দোক্কা খেলতে দেখেছে। তাকেও নিশ্চয় দেখেছে। পাঁচিলে তোষক শুকোতে দেবার সময় দেখে থাকবে কিংবা ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে সে মাঝে মাঝে যখন আকাশে তাকিয়ে থাকে।

বাতাস ও বৃষ্টির প্রাথমিক দাপট কেটে গেছে। অসমান পেভমেন্টে এখানে ওখানে জল জমেছে। তার উপর বৃষ্টির জলের লাফানি দেখে প্রিয়ব্রত আন্দাজ করল এখন হাঁটা যায় তবে বাস ধরার আগে ভিজে যেতে হবে। রাস্তায় হাঁটাচলা শুরু হয়ে গেছে। তাদের পাশের কয়েকজনও বেরিয়ে পড়ল।

"আর দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ।" খুদিকেলো মেয়েকে বলল, "চল্ এগোই। আচ্ছা··· প্রিয়ব্রতের উদ্দেশ্যে।

"আমিও যাব।"

তিনজনে রাস্তা পার হয়ে এগোতে লাগল শেয়ালদার দিকে। মেঘলা আকাশ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, মেঘ ডাকছে। অন্ধকার ভাব জড়িয়ে রয়েছে ভেজা বাড়িগুলোয়, রাস্তায়, পথচারীদেব ভেজা পোশাকেও। বৃষ্টিতে ধুলো মুছে যাওয়া গাছের পাতাগুলো পর্যন্ত কালচে দেখাচ্ছে। পেভমেন্টে ফেরিওয়ালাদের সামগ্রী কালো আর নীল প্লাস্টিক চাদরে মোড়া। এক একটা বসা গরুর মত চলাচলের পথ সরু হয়ে যাওয়ায় ধাক্কাধাক্কি হচ্ছে। প্রিয়ব্রত দু-হাত পিছিয়ে পড়েছে।

মেয়েটির পায়ে হাওয়াই চটি। গোড়ালি ক্ষয়ে চটিটা ছোট হয়ে গেছে। পা তোলার সঙ্গে কাদাজল ছিটকে উঠে শাড়ির পিছনে কালো কালো বুটি ধরাচ্ছে। ফিকে হলুদ খোলের কচি কলাপাতা রঙের পাড। বয়স্করাই এমন শাড়ি পরে, হয়তো এটা ওর মায়ের। ভিটামিনের অভাব গায়ের চামড়ায়। ব্লাউজের বাইরে ঘাড়ের উপর ফুলে রয়েছে মেরুদণ্ডের হাড়। সরু কাঁধদুটো সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে ভেজার পরিমাণটা কমাতে চাইছে।

প্রিয়ব্রত পা চালিয়ে খুদিকেলোর পাশাপাশি হয়ে বলল, "আচ্ছা বিডন স্ট্রিটে এক মামার দর্জির দোকান ছিল না!"

"হ্যাঁ, তার কাছেই গেছলুম। আমার তো ওই একটাই মামা। দোকানটা অনেকদিন আগেই বিক্রি করে দিয়েছে, এখন ওটা মাড়োয়ারির খাবারের দোকান। আমি মামার দোকানেই কাজ শিখেছি।"

সারি দিয়ে প্রচুর রুটের বাস আসে শেয়ালদার এই জায়গায়। লরেটো ডে স্কুলের সামনেই সাধারণত বাসগুলো থামে। সেখানে অপেক্ষা করছে বহু লোক।

"অতুলবাবু যে, বাড়ি চললেন?"

প্রিয়ব্রত চমকে পাশে তাকাল। বাসের জন্য অপেক্ষমানদের মধ্যে অফিসের সুবিনয় মাইতি। দোতলায়, এস্ট্যাবলিশমেন্টের। তার মতই পুরনো লোক। কখনোসখনো দেখা হয়ে যায়। দুজনেই তখন হেসে মাথা কাত করে। সুবিনয় কাজের মানুষ, কথা কম বলে।

প্রিয়ব্রত চকিতে দেখে নিল খুদিকেলোর মুখ। না, অবাক হবার মত কোন চিহ্ন তাতে নেই। চাহনি, ভুরু, কপাল কোনটাই কুঁচকে যায়নি।

"হ্যাঁ বাড়ির দিকেই তবে··· প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়ে খুদিকেলোর দিকে তাকিয়ে বলল, "এর সঙ্গে এখন একটা কাজে এই কাছেই যাব,··· কেলো আয়, তাড়াতাড়ি··· চলি সুবিনয়বাবু!"

খুদিকেলোর বাহু ধরে সে ছোট্ট টান দিল। সুবিনয়ের সঙ্গে এই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোন দরকার নেই। কথা বললেও 'অতুলবাবু' শব্দটা ওর মুখ থেকে হয়তো আর বেরোবে না। কিন্তু তবুও... প্রিয়ব্রত দশ-বারো গজ হাঁটার পর বুঝতে পারল সে খুদিকেলোর বাহুটা ছাড়েনি।

"তোর অফিসের ?"

প্রিয়ব্রত হাঁফ ছাড়ল সুবিনয়কে এড়িয়ে যেতে পেরে আর সম্বোধন সমস্যাটা আপনা থেকেই মিটে যাওয়ায়। সে হালকাও বোধ করছে, বহু বছর পর সমবয়সী একজনকে তুই বলতে পারল। 'শিবপ্রসাদ এসো' না বলে 'কেলো আয়' আপনা থেকেই মুখে এসে গেল বোধহয় নার্ভাস হওয়ার জন্য। আর খুদিকেলোও চট করে 'তোর' বলে ফেলল 'তোমার' না বলে। হয়তো ও অপেক্ষা করছিল তুই না তুমি-র দেয়ালটা টপকে আসতে পারি কিনা দেখার জন্য।

"এড়িয়ে গেলি যে, ভ্যাস্তারা পার্টি বোধহয় ?"

"হ্যাঁ, যত্তোসব আজেবাজে বিষয় নিয়ে ননস্টপ বকে যাবে। চা খাবি ?"

প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে খুদিকেলো বলল, "দেরী হয়ে যাবে ফিরতে। অন্ধকার হয়ে গেলে আমাদের রাস্তাটায় চলাফেরা বেশ বিপদের।"

"আরে কলকাতার কোন রাস্তায় বিপদ নেই শুনি ? অন্ধকার আর আলোয় কোন তফাৎ আছে কি, চল্ চল, এই তো সামনেই দোকান, চা খেতে কতক্ষণ আর লাগবে ?"

আবার সে বাহু ধরে এগোল। ধরতে ভাল লাগছে। খুদিকেলো একসময় পাড়ার ছেলেদেরই নয় তারও হিরো ছিল। ওকে ছোঁয়া মানে জীবনের একটা খণ্ডকে অনুভব করা, তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়কে স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলা।

খাবারের দোকান, সঙ্গে চা-ও বিক্রি করে। ঘেঁষাঘেঁষি টেবল আর সরু চেয়ার। অপরিচ্ছন্ন মেঝে, দেওয়াল এবং কর্মচারীদের পোশাকও। পাখা ঘুরলেও ভ্যাপসা গরমের সঙ্গে জমে রয়েছে বাদাম তেল আর চিনির রসের গন্ধ। ওরা দোকানে ঢোকার সঙ্গেই একটা টেবল থেকে চারজন উঠল।

"কেলো দেরি করিসনি, বসে পড়।"

বাবা-মেয়ে পাশাপাশি, তাদের মুখোমুখি বসল প্রিয়ব্রত। মেয়েটি ফিসফিস করে বাবাকে কিছু বলতেই খুদিকেলো মাথা নেড়ে চাপা স্বরে বলল, "তাড়াতাড়িই উঠব।"

"কেন এত তাড়া কিসের ?" প্রিয়ব্রত মেয়েটির দিকে সোজা তাকাল। "নাম কি তোমার ?"

মাথা নিচু করে বলল, "নিরুপমা।"

"তার মানে তুমি হলে নিরু। তোমাদের বাড়ি থেকে চেঁচিয়ে ডাকাডাকি করলে আমার ঘর থেকে শোনা যায়। তরু, নিরু, অরু তারপর আরো কি কি নাম যেন ?"

"বরু আর সরু। সবাই ওর ছোট। পাঁচটা মেয়ে, নিরুপমা, তরুলতা, অরুণা, বরুণা, সরলা।"

খুদিকেলো বলল "মিলগুলো তো হল না, নিরুপমার পর তো অনুপমা হবে ?"

দোকানের ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে। "কি দোব ?"

"দুটো করে সিঙ্গাড়া।"

প্রিয়ব্রত ধরেই নিয়েছিল খুদিকেলো, 'না না, শুধুই চা' বা এই ধরনের কিছু একটা বলে উঠবে। কিন্তু ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যেন খুশিই হল। নীরু আড়চোখে তার বাবার দিকে একবার তাকাল।

"আমি খাব না, খিদে নেই।"

"সে কি, দুটো তো মাত্র !" প্রিয়ব্রত হালকা স্বরে বলল। নিরুর বয়স কত ? হিতুরই বয়সী বা ছোটই হবে। হিতু চাকরিতে ঢোকার পর দিনদিন গম্ভীর, স্বল্পবাক হয়ে পড়ছে। এমনও সময় গেছে তিন-চারদিন তাদের মধ্যে একটা কথাও হয় না। সারা দিনে দেখাও তো হয় খুব কম। হিতুর পর একটা মেয়ে হয়েছিল, বেঁচেছিল তিনদিন।

"তোমার বাবার আমি ছেলেবেলার বন্ধু, এই প্রথম তোমার সঙ্গে পরিচয় হল, আজ না বলতে পারবে না। অন্য কোনদিন বরং খিদে নেই বোলো কিন্তু আজ খেতে হবে।" প্রিয়ব্রত তাকাল খুদিকেলোর দিকে। ওর চোখে অনুমোদনের চারপাশে একটা খুশির আভাও সে দেখতে পেল। হয়তো বন্ধু বলার মত কোন লোক খুদিকেলোর এখন আর নেই।

ছেলেবেলায় কেউ বন্ধু থাকলেই কি সে চিরকালের জন্য তাই রয়ে যাবে ? প্রিয়ব্রতকে খোঁচা দিল একটা অস্বস্তি। দুজনের মধ্যে অর্থ, শিক্ষা, রুচি, মর্যাদা নিয়ে গড়া অনেকগুলো সামাজিক স্তর জমে গেছে তাইতে খুদিকেলোর অনেকটাই সে দেখতে পাচ্ছে না।

তিনজনের সামনে সিঙ্গাড়ার প্লেট বসিয়ে দিয়ে গেল ছেলেটা।

"তাড়াতাড়ি খেয়ে নে।"

"একটা খাব, তুমি একটা তুলে নাও।"

খুদিকেলো নিরুত্তর প্লেট থেকে একটা সিঙ্গাড়া সহজভাবেই তুলে নিল। প্রিয়ব্রত না দেখার ভাণ করতে মুখ পিছনে ফিরিয়ে ব্যস্ত স্বরে বলল, "তিনটে চা দিও।" তারপর নীরুকে বলল, "চা খাবে তো?"

নিরু মাথা হেলাবার সময় হাসল। এই প্রথম প্রিয়ব্রতর মনে হল, ওকে বেশ ভালই দেখতে।

"তোর ছেলেকে দেখলুম মোটর সাইকেল চেপে যাচ্ছে। তুই কিনে দিয়েছিস না নিজে কিনেছে?"

"কেনার টাকা অফিস থেকে দিয়েছে। মাসে মাসে মাইনে থেকে কাটিয়ে পাঁচ বছরে শোধ করতে হবে। তেমনি আবার মাসে মাসে পেট্রল খরচটাও অফিস দেয়।"

"কত?"

"চারশো।"

"কেনার জন্য কত দিয়েছে?"

"আঠারো। নাহ্ ভুল বললাম, কুড়ি হাজার।"

খুদিকেলো খাওয়ায় মন দিল। প্রিয়ব্রত অপেক্ষা করল, হিতুর মাইনে কত জানতে চেয়ে এইবার নিশ্চয় প্রশ্ন আসবে। মোটর সাইকেল কিনতে কত দিয়েছে বা অ্যালাওন্স হিসেবে কত টাকা অফিস দিচ্ছে সেটা হিতুর কাছে শুনেছিল, কিন্তু সঠিক অঙ্কটা এখন আর মনে নেই। অনেক কিছুই এখন তার মনে থাকে না। বয়স হওয়ার লক্ষণ। কিংবা চিন্তার চাপে স্মৃতি থেকে অনেক জিনিসই ছিটকে বেরিয়ে গেছে। মঙ্গলার ছবিটা দেয়ালে টাঙান আছে বলেই ওকে মনে পড়ে।

ফণী পাল আজ এল না। কুড়ি বছরে এই প্রথমবার পয়লা তারিখে ওকে দেখা গেল না। ট্রামের নীচে যেতে পারে কি? রাতে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিল তিনকড়ি যেন দুর্ঘটনায় পড়ে। কিন্তু তার আগে বিকেলেই ওর পা কাটা যায়। কাল কাগজ খুলে দেখতে পাবে কি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বা আচার্য জগদীশচন্দ্র রোডে ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে এক বৃদ্ধ দুর্ঘটনায় পড়েন। নীলরতন সরকার হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। মাইনের টাকাটা পকেটে রয়েছে। বাড়ি পৌঁছন পর্যন্ত হুঁশিয়ার থাকতে হবে। আজ রাতে কি সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে!

"তোর বউ কত বছর মারা গেছে?"

"বারো বছর।" প্রিয়ব্রত চায়ে চুমুক দিল। বড্ড বেশি মিষ্টি দিয়েছে। শুধু খুদিকেলোই প্রশ্ন করে যাচ্ছে। লেখাপড়া না করার, শিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে না মেলামেশার জন্যই যে এমন অভব্য কৌতূহল তৈরী হয়েছে, প্রিয়ব্রত তাতে কোন সন্দেহ রাখছে না। ওকে একটু তফাতে রাখতে হবে। অবশ্য আবার কবে ওর সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। খুদিকেলোর বাড়ির রাস্তা কালীমোহন মিত্র স্ট্রিট আর তার হাঁটাচলা গুপি বসাক লেন দিয়ে, তাও শুধু বাজার আর অফিস করার জন্য।

"তুই বিয়ে করলি না কেন, করা উচিত ছিল।"

প্রিয়ব্রত হাসল। তাছাড়া আর কি-ই বা করতে পাবে। মঙ্গলা মারা যাবার পর এই ধরনের কথা সে পাঁচ-ছজনের কাছে শুনেছে। হিতুর বয়স তখন এগারো, তার তখন উনচল্লিশ। এই বয়সে অনেকে প্রথমবার বিয়ে করে। সামনের বাড়ির জ্যাঠতুতো বউদি একদিন এসে বলল, 'রাজি থাকো তো বলো মেয়ে দেখি। এইটুকু ছেলেকে কে দেখবে? কে সংসার চালাবে?' সে শুধু মাথা নেড়ে গেছে। না, না, আমিই দেখব, আমিই চালাব। সবাই ধরে নিয়েছিল মঙ্গলার জন্য ভালবাসায় সে আর কোন স্ত্রীলোককে ঘরে আনতে চায় না। মৃত স্ত্রীর স্মৃতি বুকে নিয়েই সারাজীবন কাটিয়ে যাবে। তখন সে রোজ বাজার থেকে রজনীগন্ধার মালা এনে মঙ্গলার ছবিতে পরিয়ে দিত। বছর দুই পর বন্ধ করে দেয়। মঙ্গলা খুব ভাল মেয়ে, ভাল বউ ছিল। প্রিয়ব্রত সত্যিই ওকে ভালবাসত।

আবার কেন বিয়ে করেনি সে? কারণটা সে শুধু মঙ্গলাকেই বলতে পারত। ও মারা গিয়ে প্রিয়ব্রত একটা জিনিস চিরতরে হারিয়েছে। অতি গোপন কথা গচ্ছিত রাখার মানুষ তার আর কেউ নেই।

চায়ের কাপ মুখে উপুড় করে তলানিটুকু পর্যন্ত খেয়ে খুদিকেলো ঠোঁট চাটল। "ব্যাটারা এত চিনি দিয়েছে!... বিয়ে না করে ভালই করেছিস, বোকারাই বিয়ে করে। এখনো তো ইয়ং আছিস, মেয়েমানুষ রেখেছিস?"

"অ্যাই, আমাদের কত হয়েছে?"

প্রিয়ব্রত প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে উঠে দাঁড়াল। মাইনের টাকা বাঁ পকেটে রেখেছে। ভৌমিক বলেছিল, পকেটমাররা নাকি ডান পকেটকেই টার্গেট করে। অফিসের ড্রয়ারে খামটা নিশ্চয় কাল পর্যন্ত থাকবে। ফণী পাল কাল নিশ্চয়ই আসবে।

"ঠাট্টা করে বললুম, কিছু মনে করিস না।"

"না না মনে করব কেন।" বলার সময় প্রিয়ব্রত চট করে নিরুপমার মুখটা দেখে নিল। অশ্লীল কথাবার্তা শুনলে অল্পবয়সী মেয়েদের মুখে অদ্ভুত একটা অসহায়তা ফুটে ওঠে, না শোনার ভাণ করে। কিন্তু সে দেখল নিরুপমার ঠোঁটের কোণে মোচড়ান হাসি। তার মনে হল, হাসিটা যেন বাবাকে লক্ষ্য করেই।

অন্যান্য দিনের তুলনায় বাসস্টপে ভীড় বেশি নয়। এখন সব বাসেই একই রকম ঠাসাঠাসি, সুতরাং স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে যাবার মত বাসের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। তিনজনে যে বাসটায় উঠল তাতে দাঁড়িয়ে যাওযাও কষ্টকর। মেয়েদের সব আসনই ভর্তি, উপরের রড ধরার জন্যে একমুঠো জায়গাও কোথাও নেই।

নিরুপমা ঠেলেঠুলে এগিয়ে মেয়েদের আসনের সামনে দাঁড়াল। ওরা দুজন ভীডের মধ্যিখানে বাসের চালে হাত রেখে মানুষের চাপের মাঝে নিজেদের দাঁড় করিয়ে রাখল। শেয়ালদার উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত ছুঁয়ে রয়েছে ফ্লাইওভার। বাসটা হু হু করে ফ্লাইওভার দিয়ে চলেছে। উত্তর স্টেশনে ট্রেন ধরার যাত্রীরা এগোচ্ছে দরজার দিকে। তাইতে প্রচণ্ড চাপ তৈরী হলেও বাসের মাঝামাঝি ভীড়টা সামান্য পাতলা হয়েছে। প্রিয়ব্রত বাঁ পকেট চেপে সেইদিকে সরে গিয়ে নিরুপমার গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার পিছনেই সরে এল খুঁদিকেলো।

প্রিয়ব্রত নিচু গলায় নিরুপমাকে বলল, "পকেটে টাকা রয়েছে, তুমি একটু আমার বাঁদিকটা চেপে দাঁড়াও।"

বাম উরুতে সে কোমল একটা চাপ পেল। আপনা থেকেই সঙ্গে সঙ্গে সে পিছিয়ে যেতে গিয়ে খুদিকেলোর পা মাড়াল। মেয়ে শরীরের স্পর্শ মঙ্গলার পর এই প্রথম, বারো বছর পর।

নিরুপমা মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কথামত কাজটা করতে পেরেছে কিনা জানার ইচ্ছাটা ওর চোখে। প্রিয়ব্রত ছোট্ট করে ঘাড় নেড়ে এবং চাহনিকে উজ্জ্বল করে জানিয়ে দিল, এই রকমই সে চেয়েছিল। নিরুপমা আশ্বস্ত চোখে জানলার বাইরে তাকাল।

ফ্লাইওভারের উত্তরের স্টপে যত লোক নামল প্রায় তত লোকই বাসে উঠল। প্রিয়ব্রত তাঁর জায়গা থেকে নড়ল না। মেয়েদের আসন থেকে একজন উঠেছিল কিন্তু নিরুপমা বসার জন্য চেষ্টা করেনি।

হঠাৎ থামা এবং চলা শুরুর জন্য, ব্রেক কষার বা রাস্তার গর্তে চাকা পড়ায় ঝাঁকানির জন্য প্রিয়ব্রতর উরুর উপর চাপটার কমবেশি হচ্ছে। প্রথমে যে অস্বস্তিটা জেগেছিল ধীরেধীরে সেটা কেটে যাচ্ছে। বারবার সে নিরুপমার

মুখভাব লক্ষ্য করে, এমন একটা ক্ষীণ চিহ্নও খুঁজে পেল না যাতে মনে করা যায় এই স্পর্শটা সম্পর্কে সে সচেতন।

কিন্তু প্রিয়ব্রত একটু বেশিভাবেই সচেতন হতে শুরু করেছে। কিছু একটা তার শরীরে ঘটছে, চাপা উল্লাস বা ছমছমে ভাব, যা তাকে গোপন অপরাধীর মত কুঁকড়ে রাখছে। সে এটুকু বুঝছে, কোনরকম অপরাধই তার দ্বারা ঘটান হচ্ছে না। কিন্তু শরীরটা এমন তাজা লাগছে কেন? এটা কি তার মনেও সংক্রমিত হবে?

"তোর দোতলার ভাড়াটে করে কি?" খুদিকেলো কথা শুরু করল। প্রিয়ব্রত তার চিন্তায় ছেদ টানার সুযোগ পেয়ে স্বস্তি বোধ করল।

"চাকরি করে, পি অ্যান্ড টি-তে।"

"লোক কেমন?"

"ভালই তো! ঝামেলা করে না, খুব ভদ্র। বউটিও তাই।"

"আমার কাছ থেকে বউয়ের জন্য দুটো ব্লাউজ করিয়েছে। যে ব্লাউজটার মাপে করার জন্য দিয়েছিল, সেই মাপেই করে দিয়েছিলুম। তারপর দুবার আমাকে কেটে ছোট করতে হয়েছে, নাকি ঢলঢল করছে, হাত নাকি বড় হয়ে গেছে, তলাটায় আরো ঝুল বাড়াতে হবে, পেট নাকি দেখা যাচ্ছে! সে হাজার বায়নাক্কা। তারপরও মজুরি দেবার সময় এক টাকা কমাবার জন্য আধঘণ্টা ধরে ঝুলোঝুলি।"

"অশোকবাবু এমন লোক তা তো জানতাম না।"

"জেনে রাখ। দেখবি একদিন জলকল নিয়ে, কি সদর দরজা খোলা নিয়ে, কি ছাদে কাপড় শুকোতে যাওয়া নিয়ে শুরু করে দেবে। ওদের টি ভি আছে?"

"না, নেই।"

"যাক্, অ্যান্টেনার ঝামেলাটা তাহলে নেই। তোর তো আছে?"

"আছে।"

"কালার?"

"না।"

"ফ্রিজ?"

"নেই।"

"কিনে ফেল, খুব দরকারী জিনিস।"

প্রিয়ব্রত বলতে যাচ্ছিল, তোর ফ্রিজ আছে? বললে ব্যাঙের মত শোনাবে তাই চুপ করে রইল। অশোকবাবুরা এতই নির্বিরোধী, স্তিমিত যে, সে জানে

কোনদিনই ওদের সঙ্গে মনোমালিন্য হবে না। খুদিকেলো উপকার করার ইচ্ছাতেই খবর দিয়ে হুশিয়ার করছে। কেন আর ওকে হতাশ করা! ওর দোকান থেকে সে একটা রুমালও করাবে না কোনদিন। ফ্রিজ তার আছে কিন্তু সেটা বলালে দুজনের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্যের স্তরটা অসমান হয়ে যাবে. নেই বলাতে খুদিকেলো নিশ্চয় অনেক সহজ বয়ে গেল।

"ভাবছি এবার কিনব।"

"কিনলে বলিস। হাতিবাগানে আমার বন্ধুর দোকান আছে, বললে দুশো-আড়াইশো কমিয়ে দেবে।"

একইভাবে চাপটা তার উরুতে লেগে রয়েছে। দুজনের দেহের দুটো অংশ একঘেঁয়ে ছুঁয়ে থাকলে একসময় অসাড় লাগে। মঙ্গলা আর সে এক বিছানায় শুতো। একটা সময় এল যখন কিছুই মনে হত না। যান্ত্রিকভাবে, নিয়ম মানার মতই কাজটা করত।

এখন পা-টা সে সরিয়ে নিতে পারে, মানিকতলা পেরিয়ে গেছে এবার তো নামার জায়গাটা আসছে। কিন্তু প্রিয়ব্রতর ইচ্ছে করছে না পিছিয়ে বা সরে দাঁড়াতে। নিরুপমার শরীরের কোন অংশটা তার উরুতে চাপ দিয়ে রয়েছে সে জানে। কিন্তু ওর মুখে কোন ব্যাপার নেই। বাবার বন্ধু? তার বয়সটা যদি কম হত,... হিতুর মত বয়স হলে কি মেয়েটি পাছাটা এত জোরে চেপে রাখত!

বাস থেকে নামার সময় প্রিয়ব্রত নিরুপমার দিকে ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ।"

মেয়েটির মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হল। তারা গ্রে স্ট্রীট ধরে হাতিবাগানের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

"তুই কি বাড়ি থেকে এতটা হেঁটে এসে বাসে উঠিস নাকি?"

"না না বাসে আসি। অফিস যাবার সময় কি হেঁটে সময় নষ্ট করা যায়? ফেরার সময়টাতেই হাঁটি।"

"ভালই করিস; এমনিতেই তো তুই একটু থপথপে ধরনের, স্লো। কবাডি খেলায় কেউ তোকে দলে নিতে চাইত না। ফুটবলে তো চোখ বুঁজে তোকে কাটাতুম।"

প্রিয়ব্রত হাসল। একটা রাগ দপ করে উঠেই নিভে গিয়ে ক্ষীণ জ্বালা রেখে দিল। নিরুপমা ঠিক তার পিছনেই। হয়তো শুনতে পাচ্ছে তাদের কথা। উত্তর কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় একটা বাজার এই অঞ্চল। ভীড়ে হাঁটা যাচ্ছে না একটানা। বারবার সামনে লোক, নয়তো রিকশা বা টেম্পো। দোতলা

বাস থেকে সাইকেল, দুই থেকে চার চাকার সবরকমের গাড়িতে রাস্তাটা সরু হয়ে গেছে। পেভমেন্টেও হাঁটা কঠিন নানান ধরনের অস্থায়ী দোকানের জন্য।

খুদিকেলো ঠিকই বলেছে। এত বছর পরও এসব ব্যাপার ও মনে করে রেখে দিয়েছে অথচ সে কিনা ভুলে গেছিল! সে ব্যাকে খেলত। খুদিকেলো একবার তাকে বোকা বানিয়ে চতুর্থ গোলটা দেবার পরই গোলকীপার গৌর ছুটে এসে তার পাছায় লাথি কষিয়েছিল। 'খেলতে হবে না তোকে। বেরো. ব্যাটা একটা ভোঁদড়। তার মনে পড়ল, বোকার মত সে তখন হেসেছিল। খুদিকেলো হয়তো এবার সেটাই বলবে। তার মনে হচ্ছে, ওর এসব বলার উদ্দেশ্য মেয়েকে শোনানোর জন্য।

"আমি এখন বাড়ির দিকে যাব না।" প্রিয়ব্রত দাঁড়িয়ে পড়ল। "ডাক্তারবাবুর কাছে যাব, এই রংমহলের পাশেই।"

"কি অসুখ তোর?"

"ডাক্তার ধরতে পারছে না· আচ্ছা চলি।" প্রিয়ব্রত কব্জি তুলে ঘড়িটা দেখে, মাথা হেলিয়ে নিরুপমার দিকেও তাকাল। মেয়েটি হাসল কিনা দেখার জন্য সে আর দাঁড়াল না।

খুদিকেলোটাকে তার অসহ্য লাগছে। ওব সঙ্গ এড়াবার জন্য এব থেকে আর কি-ই বা করা যেত। আসলে বৃষ্টিতে দোকানে দাঁড়িয়ে থাকাব সময় কথা না বলে ঠোঁটটা টেনেই দায় এড়াতে পারত। কথা দিয়ে পরিচয়টাকে টেনে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে আসার কোন দরকারই ছিল না। খুদিকেলোব সঙ্গে আবার কখন দেখা হবে কে জানে!

প্রিয়ব্রত ঠিক করল দর্জিপাড়ার মধ্য দিয়ে, এ গলি-সে গলি করে সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরবে। রংমহল থিয়েটার পর্যন্ত এসে ট্রামরাস্তা পার হয়ে সে একটা গলিতে ঢুকল। এই জায়গাতেই ট্রামে তিনকড়ির পা কাটা গেছিল। এখন সে কোথায় কে জানে! গৌররা বাড়ি বিক্রি করে ভদ্রেশ্বরে চলে গেছে বছর পঁচিশ আগে!

স্কুলের কোন সহপাঠীর সঙ্গেই তাব দেখা হয় না। তাদের নামগুলোও আর মনে নেই। শুধু একটা নাম সে খবরের কাগজে দেখেছিল বছর দুই আগে। 'বাঙালি বিজ্ঞানীর আন্তর্জাতিক সম্মান।' ছোট অক্ষরে হেডিং। জেনিভায় পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আলোচনাসভায় ডঃ কমলেন্দু চ্যাটার্জি সভাপতিত্ব করেছে। তার পড়াশুনো জীবনের খবরের সঙ্গে ছিল স্কুলের নাম আর স্কুল ফাইনাল পাশের বছর। একই স্কুল, একই বছর। প্রিয়ব্রত অনেক

ভেবেও কমলেন্দু চ্যাটার্জিকে স্মৃতি থেকে বার করে আনতে পারেনি। ব্রিলিয়ান্ট যখন, হয়তো এ-ওয়ান সেকশনেই বরাবর পড়ে এসেছে। সে স্কুল ফাইনাল পাশ করে দ্বিতীয় চেষ্টায়।

অফিসে ভৌমিককে বলেছিল কমলেন্দু তার বন্ধু ছিল। খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে দেখতে চেয়েছিল সমীহ, বিস্ময়, ঈর্ষা মেশানো একটা চাহনি। ভৌমিক বলল, 'অ, তাই নাকি।' একটু পরে আবার বলে, "ভাগ্যের কি পরিহাস দেখুন অতুলদা, আজ তিনি কোথায় আর আপনি কোথায়!··· না, না, তাই বলে আপনাকে আমি দোষ দিচ্ছি না। এ তো শুধু কপাল নয়, ব্রেনেরও ব্যাপার আছে।"

একসময় এইসব গলি দিয়ে বহুদিন সে স্কুল থেকে ফিরেছে। তখন সে মুখস্তের মত বলে দিতে পারত, এইবার সে দেখবে ঘুম থেকে ওঠা ফুলো ফুলো চোখ নিয়ে একটা বউ দোতলার বারান্দায় চুলে চিরুনি দিচ্ছে মাথাটা কাত করে··· এইবার দেখবে একটা ঝি কলাইয়ের ভাঙ্গা গামলায় আস্তাকুঁড়ে জঞ্জাল ফেলে রাস্তায় গামলা ঠুকছে··· দুটো বাচ্চাকে নিয়ে মা রিকশায় ফিরছে··· খয়েরি-সাদা একটা নেড়ি কুত্তা মুদির দোকানের সামনে শুয়ে··· রকে বসা হজমি- আচার- বিলিতি আমড়া··· মিষ্টির দোকানের ছেলেটা রাস্তায় জল ছিটোচ্ছে···।

প্রিয়ব্রত থমকে দাঁড়াল বাড়িটার সামনে। কাঠের বড় সদর দরজা। তারপর সিমেন্ট বাঁধান চওড়া পথ গিয়ে পড়েছে উঠোনে। উঠোনের একধারে শিবমন্দির, তার পাশে বৈঠকখানা। সে একবার ভিতরে গিয়ে দেখে এসেছিল বৈঠকখানা জুড়ে নীল আর ছাই ডোবাকাটা সতরঞ্চি পাতা নীচু তক্তপোশ। একধারে হারমোনিয়াম, বাঁয়া-তবলা, তানপুরা। কাপড়ের খোলে ঢাকা।

সদর দরজার পাশে কাঠের ছোট্ট সাইনবোর্ডটা এখনো একইভাবে দেয়ালে আঁটা, শুধু রঙটাই নতুন করা। রাস্তার আলোয় লেখাগুলো পড়া যাচ্ছে না ঠিকমত। প্রিয়ব্রত এগিয়ে সাইনবোর্ডটার কাছে দাঁড়াল। "সঙ্গীতা" নামটা আগের থেকে একটু বড় অক্ষরে। তার নীচে তিন লাইনে, "অভিজ্ঞ ও নামী শিক্ষকদের দ্বারা যত্ন সহকারে ক্ল্যাসিকাল, আধুনিক, পল্লীগীতি ও রবীন্দ্রসঙ্গীত শেখান হয়। বুধ ও শুক্র। সকাল ৮—১১ ও সন্ধ্যা ৭—৯।" তার নীচে: "অধ্যক্ষ অতুল চন্দ্র ঘোষ।"

প্রিয়ব্রতর মুখটা যখন হল্কা লাগা গাছের পাতার মত কুঁকড়ে যাচ্ছে তখনই একটা "হা-আ-আ" রব তুলে লোডশেডিং হল। চারদিক অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার সঙ্গেই ভেসে উঠল নৈঃশব্দ্য। তখন সে বাড়ির ভিতর থেকে ভেসে আসা, বিনিয়ে বিনিয়ে কান্নার মত তানপুরার ক্ষীণ সুর শুনতে পেল।

॥ ২ ॥

প্রায় হাতড়ে সে গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে এসে পড়ল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ে। অনেক দোকানেই জেনারেটরে তৈরী আলো জ্বলছে তবে তেজ কম। পেভমেন্টের অনেক জায়গায়ই আবছা আলো। মেট্রো রেলের জন্য রাস্তার মাঝ বরাবর খোঁড়া হয়েছিল। লোহার কড়ি পুঁতে তার উপর ছোট ছোট চৌকো কংক্রিটের স্ল্যাব বসিয়ে গর্ত ঢেকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাস্তাটা এখনো পরিষ্কার করা হয়নি। বড় বড় লোহার কড়ি, শিক আর রাবিশ পড়ে আছে। এরই মাঝখান দিয়ে রাস্তা পারাপারের পথ। একপাশ দিয়ে যাতায়াত করছে যানবাহন।

ঠিক ওপারেই গুপি বসাক লেন। তার বাঁদিকে সওয়াশ' বছরের পুরনো মিত্তিরদের বিরাট বাড়ি। বাড়ির বাঁদিক ঘেঁষে পূর্বপুরুষ কারুর নামেই কালীমোহন মিত্র লেন। দুটি গলিই বাড়িটার দুপাশ দিয়ে নানান ভঙ্গিতে মোড় নিতে নিতে সমান্তরালভাবে পশ্চিমে চলে গেছে চিৎপুর রোড পর্যন্ত। প্রিয়ব্রত সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পার হবার জন্য আলোজ্বলা 'নিউ মেডিকো' নামের ওষুধের দোকানটার সামনে দাঁড়াল। আলোয় যথেষ্ট জোর নেই, ছায়া পর্যন্ত পড়ছে না। এখান থেকেই তাকে রাস্তা পেরোতে হবে।

"প্রিয়··· অ্যাই প্রিয়।"

চমকে উঠল প্রিয়ব্রত। বাঁদিকে অন্ধকার থেকে চাপা গলায় কেউ ডাকল। নজর তীক্ষ্ণ করে সে যাকে আঁচ করতে পারল তাকে সে আশা করেনি।

"কেলো তুই! বাড়ি যাসনি ?" প্রিয়ব্রত এগিয়ে এসে খুদিকেলোর সামনে দাঁড়াল। "অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, নিরু কোথায় ?"

"বলছি। নিরু ওই যে, ওইখানে·· একটা বিপদে পড়ে গেছি তোকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

খুদিকেলোর মুখের ভাব বোঝা যাচ্ছে না কিন্তু গলার স্বরে চাপা ত্রাস প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়ে দেখল একটু দূরে বাড়ির দেয়ালের ধারে মানুষের ছায়া, নিরু দাঁড়িয়ে।

"লোডশেডিংটা না হলে চলে যেতুম। কিন্তু কালকেই ভয় দেখিয়ে থ্রেট করে গেছে।"

"কে থ্রেট করেছে ?"

"ওরা।"

"ওরা কে ?"

"যারা নিরুকে রেপ করেছে। এখন জামিনে ছাড়া রয়েছে... তিনজন। তুই কাগজে দেখিসনি ?"

"রে এএ এপ ! তিনজন ?... কাগজে কই দেখিনি তো !"

"আটমাস আগে বেরিয়েছিল। সব তোকে পরে বলব'খন। ওরা মারাত্মক গুণ্ডা, বড় একটা গ্যাং আছে, কেস তুলে নিতে বলেছিল। পুলিসই কেস করছে, আমরা কি করে সেটা তুলব ? পরশু মামলার ডেট।... প্রিয়, এই অন্ধকার কালিমোহন মিস্তির লেন দিয়ে নিরুর এখন যাওয়াটা ঠিক হবে না, ওকে জানে মেরে দেবে।"

খুদিকেলো দুই মুঠোয় চেপে ধরল প্রিয়ব্রতর ডান কব্জি।

"তুই বরং ওকে গুপী বসাক লেন দিয়ে তোর বাড়িতে নিয়ে যা তারপর পগাড়ের খিড়কি দোর দিয়ে ও বাড়ি চলে যাবে।... এই সামান্য উপকারটা তোকে করতেই হবে। বাড়িতে এসে সাতদিন আগে ওরা ছুরি দেখিয়ে গেছে... কাল তিনটে ছেলে দোকানে এসে আমাকে ডেকে নিয়ে বলল, মেয়েকে তুলে নিয়ে যাবে, বোমা মেরে দোকান জ্বালিয়ে দেবে। এসব কথা বাড়িতে বলিনি, বললে তো কান্নাকাটি পড়ে যাবে। দোকান উঠে গেলে সবাইকে খাওয়াব কি ?... কি যে অশান্তি আমার।"

"এত ব্যাপার হয়ে গেছে !" প্রিয়ব্রতর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। "তুই এখুনি পুলিসে যা।"

"কি লাভ গিয়ে। বলে গেছে, পুলিসের কাছে যেতে পারি কিন্তু তাতে একটার বদলে দুটো লাশ পড়বে। পুলিস কতক্ষণ, কতদিন আর পাহারা দিয়ে বাঁচাবে ?" খুদিকেলো যেন গভীর খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে। শুকনো গলায় কোনরকম আবেগ নেই।

"পরশুই মামলার ডেট।"

"হ্যাঁ। নিরুকে বোধহয় জেরা করবে উকিল। আসামীদের সনাক্ত করতেও হয়ত বলবে।"

প্রিয়ব্রতর মাথায় অজস্র প্রশ্ন, অথচ এখন প্রশ্ন করে নষ্ট করার সময়ও এটা নয়। সে দু-ধারে এবং সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ওপারে মুখ ফেরাল। মোটরের আলোয় মাঝেমাঝে উজ্জ্বল হচ্ছে পেভমেন্ট। মাটন রোল বিক্রির ঠেলা গাড়িটায় হারিকেন জ্বলছে। খদ্দের নেই। সতর্ক পায়ে লোক হেঁটে যাচ্ছে। কিন্তু নিরুকে তুলে নিয়ে যেতে পারে বলে কাউকে মনে হল না। হয়তো তারা

কালীমোহন মিত্তির লেনের ভেতরে অপেক্ষা করছে, হয়তো ওদের বাড়ির সদরেই দাঁড়িয়ে আছে। ওখানটায়ই গলিটা বেঁকেছে। সেখানে দুটো বাড়ির দেয়ালের মধ্যে একটা পনেরো গজের মাটির কানা গলি আছে। লুকিয়ে থাকা যায় গলিটাতেও। চোর-পুলিশ খেলার সময় সে নিজে বহুবার ওখানে লুকিয়েছে।

"ঠিক আছে, নিরু আমার সঙ্গেই চলুক।"

খুঁদিকেলো দ্রুত নিরুর কাছে গিয়ে কথা বলে ওকে সঙ্গে করে আনল।

"তুই কাকাবাবুর সঙ্গে যা, আমি একটু ট্রামরাস্তা দিয়ে ঘুরে দোকানে যাব।"

কথা শেষ করেই খুদিকেলো হনহনিয়ে অন্ধকারে ঢুকে পড়ল। প্রিয়ব্রত হঠাৎ খুব অসহায় বোধ করল। এমন একটা অবস্থার মধ্যে অপ্রত্যাশিত পড়ে গিয়ে সে বুঝে উঠতে পারছে না, তার ভয় পাওয়ার মত কিছু এতে আছে কি না। বাঁ পকেটে হাত দিয়ে সে মোটা একটা শক্ত জিনিস অনুভব করল। এটা নিরাপদে বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে, সেই সঙ্গে এই মেয়েটিকেও। দুটো কাজ একই ধরনের।

"তুমি আমার পাশে পাশে চলো।"

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পার হয়ে অন্ধকার গুপি বসাক লেনে ঢোকার আগে প্রিয়ব্রত প্রায় এক মিনিট দাঁড়াল চোখ সইয়ে নিতে। রাস্তাটা তার মুখস্থ কিন্তু নিরুর নয়। বৃষ্টিটা এখানে কতটা হয়েছে সে জানে না। যদি জোরে হয়ে থাকে তাহলে কোথায় কোথায় জল জমবে সে জানে। কয়েকদিন আগে জলের ফেরুল বদলাতে কর্পোরেশনের লোকেরা পাঁচের-এক নম্বর বাড়ির সামনে রাস্তা খুঁড়েছিল। জায়গাটায় মাটির ঢিপি হয়ে আছে। বৃষ্টিতে কাদা হবেই।

"তুমি আমার পেছনে এস। রাস্তায় ঢিপি আর গর্ত্তো আছে।"

নিরু তার পিছনে এল। প্রিয়ব্রত মন্থর এবং সতর্ক হয়ে হাঁটছে। কুকুর শুয়ে থাকতে পারে, সামনে থেকে আসা মানুষের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে। কয়েকটা বাড়ির বাইরে রক, তাতে মানুষ বসে। ওরা তেরো নম্বর বস্তি বাড়ির নয় তো পাকা বাড়ির একতলায় এক ঘর নিয়ে বাস করা পরিবারের লোক। লোডশেডিং হলে মেয়েরাও রকে এসে বসে। লাল টিপের মত একবিন্দু আগুন উজ্জ্বল হয়ে উঠেই ঝিমিয়ে পড়ল। লোকটি পাশ দিয়ে যাবার সময় প্রিয়ব্রত বিড়ির গন্ধ পেল।

মোমবাতির আলো কয়েকটা বাড়ির জানালা দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। জানলার সামনে হাঁটা লোকের গায়ে পড়ে শুধু একটু কেঁপে

উঠছে।

নিরু রেপড হয়েছে, ধর্ষিতা। ··· পাশবিক অত্যাচার, বলাৎকার ··আট মাস হয়ে গেল অথচ সে জানে না ' ওকে দেখেও তো মনে হয়নি। অবশ্য মনে হবার কথাও নয়। এত দিন পর কোন মেয়েকে ঘণ্টাখানেক দেখেই কি এসব মরচে ফেলা যায় ? প্রিয়ব্রত নিজেকে বোকা মনে করল। মুখে চোখে 'রেপড হয়েছি' বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে কেউ কি বাইরে বেরোয় ? এত বড় একটা কাণ্ড এত অল্প বয়সে জীবনে ঘটল, তার উপর মামলা, জান খতমের হুমকি· ·এখন ওর মনের মধ্যে কি ঘটছে ?···ফণী পাল আজ এল না, কুড়ি বছরে এই প্রথম ! তার নিজের মনেইবা কি ঘটছে ?

"কেরোসিনের দোকানে খবর নিলুম, কাল দুপুরে আসবে বলল।"

"রোজই তো তাই বলে।" অন্ধকারে রকে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ।

তার রান্না হয় কয়লার উনুনে। কিন্তু স্টোভের জন্য কেরোসিন দরকার হয়। খবরটা তিলুকে দিয়ে রাখতে হবে। এবার পাঁচের-এক আসছে।

"এই জায়গাটায় একটি ঢিপি আছে· আচ্ছা আমার হাতটা ধরো।"

অন্ধকারে প্রিয়ব্রত হাত বাড়াল। নিরুপমার বাঁহাতের পাঁচটা আঙুল সে মুঠোর মধ্যে পেল। ঘষে ঘষে পা এগিয়ে জায়গাটা পার হয়েই প্রিয়ব্রত থমকে গেল। কয়েকটা ছায়ামূর্তি সামনে থেকে আসছে। মুঠোয় ধরা আঙুলগুলো হঠাৎ শক্ত হয়ে গেল। নিরু তার পিঠ ঘেঁষে সরে এসে ডান হাত দিয়ে বাহু আঁকড়ে ধরল। মরচে ধরা কব্জা খোলার মত একটা শব্দ বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে।

প্রিয়ব্রত বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে সরে এল নিরুকে একহাতে জড়িয়ে। তার বাঁ দিকে একটা খোলা জানলা, ঘরের ভিতরটা অন্ধকার। জানলায় একটা শিশুর ছায়া।

"মা, দুটো ভূত আমাদের জানলায়। দেখবে এসো।"

"সারা দুপুর দুষ্টুমি করলে ভূত আসবেই তো।" ভেতর থেকে ভেসে এল মায়ের গলা : "এবার ধরে নিয়ে যাবে তোমায়।"

তিন-চারটি লোক তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। নিজেদের মধ্যে কিছু বলাবলিও করছে না। পায়ের শব্দগুলো মিলিয়ে যাবার পর প্রিয়ব্রত বুঝতে পারল একহাতে সে নিরুকে বুকের কাছে টেনে চেপে ধরে রয়েছে আর নিরু একহাতে শক্ত করে ধরে আছে তার কোমর।

জানলায় শিশুর ছায়াটি নেই। বোধহয় ভূতের ভয়ে মা'র কাছে গিয়ে আশ্রয়

নিয়েছে।

"ভয় নেই ওরা নয়। এই ঘুরেই দুটো বাড়ি গেলেই…।"

ধীরে ধীরে নিরুর হাতটা তার কোমব থেকে ঝুলে পড়ল। প্রিয়ব্রত তার হাতটাও তুলে নিল ওর কাঁধ থেকে। কথা না বলে তারা সমকোণে বাঁকা রাস্তা ঘুরে দুটো বাড়ি পার হয়ে দাঁড়াল।

"এই সরু গলির শেষের বাড়িটা।"

দু'পাশে দেয়াল তার মাঝেব সরু পথেব দিকে প্রিয়ব্রত আঙুল দিয়ে দেখাল। গুপি বসাক লেনেব থেকেও অন্ধকার আরো ঘন এই গলিটায়। এখানে ওরা অপেক্ষা করে থাকে যদি ? প্রিয়ব্রত অনিশ্চিত ভাবে বলল, "আব কি, এবার এসে গেছি। আমার পেছনে এসো।"

ঠাসা অন্ধকার ঠেলে ঢোকার মত দু হাত বাড়িয়ে পা ফেলে ফেলে সে এগোচ্ছে। পিছনে নিরুর পায়ের শব্দ পাচ্ছে না। সামনে থেকে কিংবা পাস থেকে আচমকা আক্রমণ হলে সে কি কবরে ? ওরা কি মাথায় লাঠি কষাবে ? তাহলে সে চেঁচিয়ে উঠবে। লোকজন ছুটে আসতে কতক্ষণ সময় নেবে ? ততক্ষণে নিরুকে তুলে নিয়ে যাবার যথেষ্ট সময় পাবে।

যদি বুঝতে পারে চিৎকারটা তার তাহলে জ্যাঠামশায়েব বাড়ি থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে না। ওদের সঙ্গে তার বা হিতুর এখন বাক্যালাপ নেই।

"বাঁ দিকের এই দরজাটা আমার জ্যাঠামশাইদের, এখনো বেঁচে আছেন…আর ওইটে আমাব।"

কলিং বেলের সুইচের জন্য প্রিয়ব্রত দরজার মাথায় হাত তুলেই নামিয়ে নিল। লোডশেডিং হলে মানুষ অনেক রকম ভুল করে। দরজায় কড়া নাড়তে গিয়ে সে ইতস্তত কবল। এখন তিলু তিনতলায়। কড়া নেড়ে অত দূর পর্যন্ত শব্দটা পৌঁছে দিতে হবে।

অফিস থেকে হিতুর ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। কড়া নাড়লে নিস্তব্ধ রাতে যে শব্দটা হয় সেটা কানে একটু বেশিই বাজে। এক রাতে হিতু কড়া নাড়তেই জ্যাঠামশায়ের বাড়ি থেকে মেয়ে গলায়, বোধহয় মেজ ছেলের বউ, গজগজ কবে বেশ জোবেই বলে ওঠে, 'এই এক জ্বালা হয়েছে, রাতদুপুরে বোজ রোজ লোকের ঘুম ভাঙ্গিয়ে কড়া নাড়া !' সঙ্গে সঙ্গে মেজদার ছোট ছেলে বাবু দোতলার বারান্দা থেকে চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'মাথায় এক বালতি জল ঢেলে দিলে ঠিক হবে।' হিতু চুপ করে থাকেনি। পাল্টা উত্তর দেয়, 'ঢেলে দ্যাখ না একবার।' বাবু দোতলা থেকে নেমে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল।

'কি করবি তুই ? হ্যাঁ, জল ঢালব। খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়েছিস বলে কি রাত্তিরে লোককে জ্বালাতন করার রাইট জন্মেছে ?...নাড় আর একবার কড়া, দ্যাখ্ কি করি ?'

প্রিয়ব্রত ততক্ষণে একতলায় নেমে এসেছে। সে হাত ধরে হিতুকে বাড়ির মধ্যে টেনে এনে দরজা বন্ধ করে দেয়। নয়তো হাতাহাতিতে ঝাগড়াটা গড়াত। বাবু আর হিতু একই বয়সী। বাবু যখন হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দ্বিতীয়বার দিল হিতু তখন বি-এ ফাইনালের জন্য তৈরি হচ্ছে। বাবু এখন তার কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারি।

প্রিয়ব্রত পরদিনই ইলেকট্রিক মিস্ত্রি ডেকে তিনতলায় কলিং বেল লাগায়।

"তিলু...তিলুউউ।" মুখ তুলে প্রিয়ব্রত চীৎকার করল।

"যা-আ-আ-ই বাবু।" তিনতলা থেকে গলা ভেসে এল। মিনিট খানেকের মধ্যেই দরজা খুলে দিল বছর পনেরোর, হলুদ গেঞ্জি আর হাফ প্যান্ট পরা একটি ছেলে। হাতে কেরোসিন ল্যাম্প। নিরুকে দেখে তার চোখ কৌতূহলী হয়ে উঠল।

"এসো।"

নিরু ভিতবে ঢোকার পর প্রিয়ব্রতই দবজায় খিল দিল। "হ্যারে এখানে জলঝড় হয়েছে ?"

"হয়েছে। পাচ-দশ মিনিট খুব বাতাস চলল, বৃষ্টি তেমন হয়নি।"

একতলায় কল-পায়খানা আর দুটি ঘর। দেড় বছর আগেও ঘর দুটি ভাড়া দেওয়া ছিল এক বই বাঁধাইওলাকে। বৌ আর দুটি ছেলেও বাঁধাইয়ের কাজে তার সঙ্গে হাত লাগাত। ব্যবসা টিমটিম করে চলত। সাত মাসের ভাড়া বাকি রেখে লোকটা যক্ষ্মায় হাসপাতালে মারা যাবার পরও প্রিয়ব্রত দু'মাস ওদের থাকতে দিয়েছিল। তারপর অনেকেই ভাড়া নিতে এসেছিল। কিন্তু কোথা থেকে যে শুনল ওই ঘরেব ভাড়াটে যক্ষ্মায় মারা গেছে, আর তারা কথা বলতে দ্বিতীয়বার আসেনি। প্রিয়ব্রত'র স্থির বিশ্বাস জ্যাঠামশাইদের বাড়ির কেউই ভাঙচিটা দিয়েছে।

হিতু বলেছিল, 'খালিই থাক্, দরকার নেই আর ভাড়াটে বসিয়ে। দুজনের রোজগারই তো যথেষ্ট !'

'না, আমার টাকার দরকার।'

'কেন ? কি জন্য ?'

হিতুকে সে বলতে পারেনি কেন টাকা তার কাছে এত দরকারি। শুধু

মঙ্গলাকেই সে বলেছিল।

কিন্তু ভাড়াটে বসিয়ে সে হিতুকে অখুশি করতে পারেনি। ঘরদুটো তালা দেওয়াই রয়ে গেছে। হিতু ছাড়া তার আর কেউ নেই।

"তুমি খাটেই বোস।"

প্রিয়ব্রত ল্যাম্পটা টেবিলে রাখল। নিরু খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসল। চেয়ারটা ঘুরিয়ে মুখোমুখি বসে সে ঘরের সর্বত্র চোখ বুলিয়ে বলল, "আমি আসবাব দিয়ে ঘর বোঝাই করা একদম পছন্দ করি না। এই টেবিল, একটা চেয়ার, খাট, আলনা আর দেয়াল আলমারি।"

নিরু কি স্বচ্ছন্দ হবে এইসব শুনে? ওদের ঘরে খাট যদিও বা থাকে নিশ্চয় টেবিল-চেয়াব নেই। মঙ্গলার স্টীলের আলমারিটা এখন হিতুর ঘরে। তার আর ওটা দরকার হয় না।

"ওহো, একটা টিভি সেট রয়েছে।"

নিরু টিভি-টা থেকে দৃষ্টি দেয়ালে মঙ্গলার ছবিতে রাখল। দেয়াল আলমারির উপবের তাকটায় কাঁচ লাগাল ভা ছাড়া পাল্লাদুটো কাঠের। কাচের ওপাশে কয়েকটা বাঁধানো বই। বিয়েতে পাওয়া বই মঙ্গলা যত্ন করে রেখেছিল। এখনো যত্নেই আছে।

"এসব তোমার কাকিমার।" প্রিযব্রত বইগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল।

তিলু দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। হিতুরই বাতিল পুরনো প্যান্টটা এর মধ্যে পরে নিয়েছে। চোখেমুখে দাযিত্ববোধ ও বয়স্ক হবার চেষ্টা।

"চা কবব?"

"এই দিদিকে চিনিস?"

"আমাদেব পেছনের বাড়িতে থাকে।"

"ওর বাবা আমার ছেলেবেলায় বন্ধু। নিরু চা খাবে?"

"না। বাবা ছাড়া আমরা আব কেউ চা খাই না।"

"এক কাপ আমাকে করে দে। আব শোন, কাল দোকানে কেরোসিন আসবে।"

নিরু রেপড হল কোথায়? কি ভাবে? কারা সেই লোকগুলো? ওকে কি এই নিয়ে প্রশ্ন করাটা ঠিক হবে? এত মেয়ে থাকতে ওকে কেন? পুরুষদের তৃপ্ত করাব মত কোন গুণই তো ওব শরীরে নেই!

একটু আগেই রাস্তায় ওকে বুকের কাছে টেনে ধবে রেখেছিল অথচ এমন একটা ব্যাপার তাকে আড়ষ্ট করল না বা নাড়া দিল না, সঙ্গে সঙ্গেই তা ভুলে

গেছে। ভয় যে কিভাবে মানুষকে গিলে খায়!

"তোমার বাবার কাছে কি কখনো আমার নাম শুনেছ? কখনো কি আমার কথা বলেছে?"

"শুনেছি। আপনারা ছোটবেলায় খেলতেন একসঙ্গে। আর, আপনি ভাল গান করতেন।"

প্রিয়ব্রতর মুখে হাসি ছড়াল, রেডিওর অনুরোধের আসর শোনার জন্য জ্যাঠামশাইয়ের ঘরে গিয়ে বসত। সেজদার নির্দেশে রেকর্ড থেকে গান টুকতে হত। ঝড়ের মত সে পেন্সিল চালাতে পারত। সেজদার সখ ছিল আধুনিক গাইয়ে হওয়ার; এখন সে চাঁদনিতে একটা ওষুধের দোকানের ক্যাশিয়ার। রাতে যেদিন গলা ছেড়ে গান ধরে সবাই বুঝে যায় ও মদ খেয়ে এসেছে। প্রিয়ব্রত গান তুলত সেজদার কাছে।

"তোমাদের রেডিও আছে?"

"আছে। অনেক দিন ব্যাটারি কেনা হয়নি।"

ওর মুখে প্রাণের ভয়ে ভীত হবার ছাপ কোথাও কি দেখা যাচ্ছে? টিকলো নাকের পাশা থেকে ঠোঁটের কোল পর্যন্ত বসে যাওয়া অংশটা ফ্যাকাসে লাগছে। কোলেব উপর হাত দুটো রেখেছে জড়োসড়ো করে। মাঝে মাঝে মুখ নিচু করে ফেলছে। রেপড হবার সময় কি চেঁচিয়েছিল? বাধা দিচ্ছিল? হাত দুটো তো খুবই রুগ্ন!

"বাবার সঙ্গে গেছিলে কোথায়?"

"দাদুর কাছে, বাবার মামা হন।"

"ওকে আমি ছোটবেলায় দেখতাম, তোমাদের বাড়িতে আসতেন। কালো রঙ, খুব লম্বা, সামনেব দাঁত দুটো উঁচু।"

"নাকটাও তো খুব উঁচু!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাই আগে বলা উচিত ছিল।…এখন তো উনি খুব বুড়োই হবেন?"

"পক্ষাঘাত হয়েছে। বিছানাতেই দিনরাত শুয়ে থাকে।"

"দেখাশোনা করে কে? কে কে আছেন বাড়িতে?"

"ছেলে, ছেলের বউ। ওরা একদমই দেখে না। একটা ঝি আছে, সেও যত্ন করে না। বাবা সেইজন্যই তো আজ আমায় নিয়ে গেছিল। কিন্তু বৌটা…মানে কাকিমা আমায় রাখতে রাজি হল না।"

"কেন? এতে তো ওদেরই সুবিধে হত। সেবা করার জন্য একজন সেধে

এগিয়ে এসেছে···রাজী না হওয়ার কি আছে ?”

নিরু মুখ নামিয়ে নিল। তিলু চা নিয়ে এসেছে। কাপটা টেবিলে রাখার সময় প্রিয়ব্রতর মনে হল আলোটা ম্লান হয়ে পড়েছে, বোধহয় তেল কমে গেছে। লোডশেডিং কতক্ষণ যে চলবে তার স্থিরতা নেই। এখুনি বিদ্যুৎ আসতে পারে কিংবা মাঝরাতে। তবু রক্ষে ঝড়বৃষ্টিতে গরম খানিকটা কমেছে।

“রুটি কি করে ফেলেছিস ?”

“এই তো করতে বসেছিলুম।”

সকালে রান্না করে ফ্রিজে রাখা হয়। রাতে শুধু গরম করে নেওয়া। তিলু চলে যেতে সে চায়ের কাপে চুমুক দেবার সময় দেখল নিরু মাথা নিচু করেই রয়েছে। প্রিয়ব্রত শব্দ করে দ্বিতীয় চুমুক দিতেই সে মাথা তুলল। চোখাচোখি হওয়ার পর নিরু চোখ নামিয়ে মৃদু স্বরে বলল, “ওরা সব জেনে গেছে।”

কি জেনে গেছে ? এটা বলতে গিয়েই প্রিয়ব্রত কথা বলার ঝোঁকটাকে সামলে নিল। নিরু অবশ্যই জানে তার সামনে বসা এই লোকটাকে তার বাবা ঘটনাটা জানিয়ে দিয়েছে। এখন না জানার ভাঁন করে প্রশ্ন করাটা নিষ্ঠুরতারই সামিল হবে। ও নিজের থেকে যদি কিছু বলে তো বলুক।

“বাবা বলল, আমার মেয়ের তো কোন দোষ নেই তাহলে তোমাদের কেন বদনামের এত ভয় ? আর ব্যাপারটা জানেই বা কে ? কাকিমা বলল তার বাপের বাড়ির লোকেরা জানে !”

“আশ্চর্য তো ! এতে বদনামের কি আছে ? এটা তো একটা পরোপকার···কর্তব্য, গর্বের জিনিস ! আমি হলে তো বলতাম থেকে যাও।”

প্রিয়ব্রত বুঝতে পারছে না কেন সে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু কথাগুলো বলে তার নিজেকে ভাল লাগছে। নিরুর চোখে ভরসা পাবার মত একটা ছায়া যেন সে ভেসে যেতে দেখল। এইরকম একটা ছায়া সে নিজের চোখেও তো পেতে চায় !

“তাছাড়া ওদের ওখানে থাকলে তুমি নিরাপদও হতে। এখানে যে বিপদ—” প্রিয়ব্রত অসম্পূর্ণ রয়ে গেল। বিপদের কথা এখন নিরুকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত হবে না।

“বাবা তো সেই জন্যই আমাকে নিয়ে গেছিল।”

তাহলে সেবা করাটা উদ্দেশ্য ছিল না ! খুদিকেলোর কাছে অবশ্য এখন মেয়ের, নিজেদের জীবন বাঁচানোই বড় প্রশ্ন। তবু প্রিয়ব্রত একটু দমে গেল।

“তুমি জান তোমার বিপদ কতটা ?”

"হ্যাঁ।" নিরুর মাথাটা সামান্য হেলে গেল।

ওর কি ভয় করছে না? হয়তো ঘরের মধ্যে বসে থেকে থেকে জীবনের সুন্দর দিকটা সম্পর্কে কোন ধারণাই ওর মধ্যে তৈরী হয়নি। সুখের স্বাদ পেলে ভয় পেত।

প্রিয়ব্রত দরজাব দিকে তাকাল। তিলু রান্নাঘরে। কেউ কথা বললে কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ওর শোনার অভ্যাসটা বহুবার বলেও ছাড়ান যায়নি। আলোটা আরো যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে। পলতে উসকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়েও সে টেনে নিল। নিরু ম্লান হয়েই থাক এখন।

"কি বিপদ বল তো? তুমি কি জান···।"

"ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। সেই লোকটা, যে সেদিন আমাকে···" নিরু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। সব কি খুলে বলতে হবে ধরনের প্রশ্ন ওর চাহনিতে।

"বুঝেছি। সেই লোকটা···তারপব কি?"

"হপ্তাখানেক আগে দুপুরে এসেছিল। আমি সদর দরজায় দাঁড়িয়ে কথা বললুম। মা তখন ঘুমোচ্ছিল। বাবা ছিল না। লোকটার নাম অমর। বলল, যা হবার হয়ে গেছে এই নিয়ে আর বেশি ঘোঁট পাকিও না, তাতে শুধু ক্ষতিই হবে। দু'হাজার টাকা দোব, চুপ মেরে থাক।

"অমরের সঙ্গে আর কেউ ছিল?"

"হ্যাঁ, গুলে নামে একটা ছেলে ছিল। ওকেও পুলিশে ধরে।"

"শুধু এই কথা বলতেই এসেছিল?"

"বলল কোর্টে যখন কেস উঠেছেই তখন একটা কিছু তো ব্যবস্থা বাঁচার জন্য করতে হবে।" আমাকে অমর বলল, 'যখন আমাদের দেখিয়ে কোর্টে তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে এরা এরাই কি সেদিন সন্ধ্যেবেলায় কারখানা ঘরে তোমার ওপর অত্যাচার করেছিল? তুমি বলবে না···এরা নয় অন্য লোক।' বলল, এতেই কেস কেঁচে যাবে।"

"কারখানা!···কিসের কারখানা?"

"কাডবোর্ড বাসকো তৈরীর কারখানা, বৌবাজারে। সবে দেড় মাস কাজে ঢুকেছি, তখনই এটা হল।"

"ওরা সেখানে কাজ করত?"

"শুধু বাচ্চা বলে ছেলেটা কাজ করত। অমর আর গুলে কারখানা বন্ধ হবার পর আসত। ওখানে বসে মদ খেত, জুয়া খেলত। ওখানে বোমা রাখতেও দেখেছি।

"তুমি কি পুলিশের কাছে এদের নাম বলেছিলে ?"

"হ্যাঁ, তিনজনের নাম বলেছিলুম।"

"তারপর ?"

"তারপর অমর বলল, 'তখন মাথার ঠিক ছিল না তাই ভুল করে এদের নাম বলে ফেলেছি বলবে। মোট কথা তুমি আমাদের চেন না, জান না এটাই জজকে বুঝিয়ে দেবে।' আমি তখন বললুম, আপনারা যে মেয়েটার সব্বোনাশ করলেন তার জীবন নষ্ট করে শেষ করে দিলেন আর এখন নিজেদের বাঁচাবার জন্য তাকে দিয়েই মিথ্যে কথা বলাবেন ? তাইতে অমর বলল, 'তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এখন তক্কো করার সময় নেই। দু হাজার টাকা পাবে, প্রাণটাও বাঁচবে, আবার কি চাও ?' তারপরই একটা ছুরি বার করল। স্প্রিং টিপতেই অ্যাত্তো বড় ফলা বেরোল। আমার পেটে ঠেকিয়ে বলল, 'বাঁচার ইচ্ছে সব মানুষেরই আছে। আমার আছে তোমারও আছে। এই বাড়ির মধ্যেই তোমায় শেষ করে দিয়ে যাব, কেউ টেরও পাবে না। যা বললুম সেই ভাবে কোর্টে বলবে, দু হাজার এই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাব' এই বলেই ওরা চলে গেল।"

"তুমি বাবাকে বলেছ ?"

"হ্যাঁ। বাবা, মা, বোনেরা খুব ভয় পেয়ে গেছে। মা বলছে 'কোর্টে যেতে হবে না, টাকারও দরকার নেই, কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাক।' কিন্তু কোথায় আমি পালিয়ে গিয়ে থাকব ? আমাদের তেমন কোন আত্মীয়স্বজন তো নেই।"

ম্লান আলোয় নিরুর মুখটা করুণতার পরের ধাপে নেমে বড় বীভৎস দেখাচ্ছে। প্রিয়ব্রতকে এই মুখটি মনে পড়িয়ে দিল কুড়ি বছর আগের একটা দৃশ্য।

এই ঘরেই সে উবু হয়ে বসে দু হাতে ফণী পালের দুটো পা চেপে ধরে রয়েছে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মঙ্গলা। পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে হিতু।

"ফণীদা আপনাকে তো পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি। তখন বলেছিলেন আর দিতে হবে না। তাহলে আবার এখন কেন···মাসে মাসে তিনশো দিলে আমাদের চলবে কি করে ? লোয়ার ডিভিশন ক্লার্কের মাইনে কত তা আপনি জানেন। প্রায় আদ্দেক মাইনে আপনি চাইছেন।"

"দ্যাখো প্রিয়, এই মাইনের এক পয়সাও তোমার পাওয়ার কথা নয়। এই চাকরিটা কোন দিন কি তুমি পেতে যদি না আমি ব্যবস্থা করে দিতুম ? আমিই অতুলচন্দ্র ঘোষের বি-এ সার্টিফিকেট যোগাড় করে তার নামে তোমাকে পরীক্ষায়

বসাই। তোমার অফিসের বড়বাবু সুবল ভটচাজ আমার নিজের লোক। তাকে দু হাজার খাওয়ালুম। সে ভেতর থেকে ব্যবস্থা করে চাকরিটা পাইয়ে দিলে। কথা ছিল অতুলচন্দ্র ঘোষ নামটা বদলে সে পরে প্রিয়ব্রত নাগ করে দেবে। অনেকবার তাকে আমি মনে করিয়েও দিয়েছি। করব, করছি করে সুবল ভটচাজ মাসের পর মাস কাটিয়ে শেষকালে অন্য ডিপার্টমেন্টে বদলি হয়ে গেল। তারপর তো সে রিটায়ার হয়ে গেছে। এসব তো তুমি জানই।

"হাঁ ফণীদা জানি। আমিও তো মাসের পর মাস প্রতিটি দিন ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে যাচ্ছি, এই বুঝি ধরা পড়লাম। এই বুঝি আসল পরিচয়টা ফাঁস হয়ে গেল। আমার এই যন্ত্রণাটাও আপনি বোঝার চেষ্টা করুন।"

"চেষ্টা করেছি বলেই তো এখন এসেছি। এবার থেকে মাসে মাসে তিনশো টাকা দিয়ে এর প্রায়শ্চিত্ত করো। দেখবে অনেক শান্তি পাচ্ছ। এখন যদি তোমার অফিস জানতে পারে তুমি অতুলের নাম আর সার্টিফিকেট ভাঁড়িয়ে গত পাঁচ বছর ধরে চাকরি করে চলেছ তাহলে কি শাস্তি তুমি পাবে জান? না না জেলটেল হওয়ার কথা বলছি না, ওসব তো আছেই। এছাড়াও পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়স্বজন সমাজ যখন জানতে পারবে তখন? ব্যাপারটা ভেবে দেখেছ কি? তোমার ছেলে যখন জানতে পারবে তার বাবা ছিল একটা ভণ্ড, একটা জালি লোক...।" ফণী পাল ডান চেটোটা গালে বুলোতে বুলোতে দরজায় পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকা মঙ্গলার দিকে তাকিয়েছিল।

"সামনের মাস থেকেই আমি টাকা দেব। আপনি দোহাই বাড়িতে নয় অফিসে পয়লা তারিখে আসবেন।"

ফণী পালের আঙুলে তখন ছিল জমাট শুকনো রক্তের মত একটা পলার আংটি। প্রিয়ব্রত একদৃষ্টে সেটার দিকেই তাকিয়ে ছিল। তখন মনে হয়েছিল তার হৃৎপিণ্ডটাকেই গালের ওপর বোলাচ্ছে।

'বেশ তাই হবে।' একতলায় নামার সময় ফণী পাল নীচু গলায় বলেছিল, "সবাই বাঁচতে চায়। বুঝলে প্রিয়, তুমি, আমি সবাই।

ফণী পাল আজ আসেনি। কুড়ি বছরে এই প্রথম।

প্রিয়ব্রত একদৃষ্টে নিরুর মুখের দিকে তাকিয়ে মঙ্গলাকেই যেন দেখল। ভয়ে, অসহায়তায় পাণ্ডুর মুখটা পাতলা টিনের মুখোশের মত দেখাচ্ছিল। কান্না চাপতে চাওয়ার চেষ্টায় মুখোশটা দুমড়ে গিয়ে যা হয়ে উঠল, সে আর তাকিয়ে থাকতে পারল না।

"তোমার তখন কি মনে হয়েছিল ?"

মুখ নীচু করে, ফিসফিস স্বরে সে জানতে চাইল। এই প্রশ্নটা মঙ্গলাকেই কোন একদিন জিজ্ঞাসা করবে ভেবে রেখেছিল। করা আর হয়নি।

"আমার ঠিক মনে নেই।...বোধহয় বাঁচবার কথাই তখন ভেবেছিলুম।...আমি অন্ধকার ঘর থেকে যখন ছুটে বেরিয়ে গেছিলুম পরনে তখন ছিল শুধু সায়াটা আর ছেঁড়া ব্লাউস। রাস্তায় অনেকটা ছোটার পর একটা লোক আমায় ধরে দাঁড় করায়। জিজ্ঞেস করে কেন আমি এভাবে ছুটছি। সঙ্গে সঙ্গে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেল। তারাই আমায় থানায় নিয়ে যায়।"

"এই কাজটা কে যোগাড় করে দিয়েছিল ?"

"বাবার এক চেনা লোকের বন্ধু হল মালিক। সেই বলে কয়ে ঠিক করে দিয়েছিল। রোজ ছ'টাকা।"

"তোমার এই ব্যাপারটা খবরের কাগজে বেরিয়েছিল ?"

"আমরা তো কাগজ নিই না তাই প্রথমে জানতুম না। আমাদের সামনের বাড়ির মাসিমা তিরুকে ডেকে জিজ্ঞেস করে 'হ্যাঁরে তোর দিদির কি হয়েছে রে ? কাগজে বেরিয়েছে গণধর্ষণ করেছে ওকে ?' তারপর চুল কাটার সেলুনের একজন বাবাকে কাগজ দেখিয়ে বলে, 'ঠিকানা আর নাম দেখে মনে হচ্ছে আপনারই মেয়ে ?' এরপর আমাদের পাড়ার সবাই জেনে যায়।"

"তোমার তাতে অসুবিধে হত না ?...মানে তোমার কি খুব লজ্জা করত ?"

প্রিয়ব্রত ল্যাম্পের পলতে উসকে দিল। সে নিরুর মুখ ভাল করে দেখতে চায়। চোখের মণিতে ঔজ্জ্বল্যের হেরফের, ঠোঁটের কেঁপে ওঠা বা গালের চামড়ার সামান্য কুঞ্চনও সে নজরছাড়া করতে রাজী নয়।

এটা তাকে জেনে রাখতে হবে। যদি সে কোন দিন ধরা পড়ে তাহলে তার অবস্থাটা কি হতে পারে ? নিরু আর সে অবশ্য একই জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। বয়সে, শিক্ষায়, সামাজিক, আর্থিক সব ক্ষেত্রেই বিরাট পার্থক্য। ওর কোন আত্মীয় নেই, তার আছে। সামনের বাড়িতেই সাত-আটজন দাঁত বার করে হাসবে, চেঁচিয়ে টিপ্পুনি কাটবে।

তাছাড়া নিরু মেয়ে, দুর্বল, গরীব...জোর করে পাশবিক অত্যাচার...খবরের কাগজের এই শব্দ দুটো খুব প্রিয়। আর সে পুরুষ, বয়স্ক, জেনেশুনেই নাম ভাঁড়িয়ে চাকরি করেছে। ঠকিয়ে বছরের পর বছর মাইনে নিয়েছে...তারা দুজন একই রকম প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারে না।...তাছাড়া তার হিতু রয়েছে !

নিরু আট মাস কাটিয়েছে। তার এখনো শুরুই হয়নি। যদি হয় ? সে তীক্ষ্ণ

চোখে তাকাল। মুখ নামিয়ে নিরু অন্যমনস্ক চোখে মেঝেয় তাকিয়ে। স্বীকার করতে হয়তো লজ্জা পাচ্ছে।

"বলো। এখনো কি তোমার লজ্জা করে?"

প্রিয়ব্রত নিজের গলার আওয়াজে অপ্রতিভ হল। প্রেম নিবেদনের সময় নাটকের প্রেমিকদের স্বর এই রকম সর্দিভরা হয়ে যায়।

নিরু যেন ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠল। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলল, "লজ্জা! কই না তো! লজ্জা করবে কেন?"

"প্রথম প্রথম করেনি?"

"দুখ্যু হত, কষ্ট হত। ছত্রিশ দিনের রোজ পেয়েছিলুম। মাঝে একটা দিন বাংলা বনধ হল, নইলে—সাঁইত্রিশ দিন হত। দুশো টাকার ওপর রোজগার করেছিলুম।"

নিরুর মুখে এই প্রথম সে একটা স্বচ্ছ প্রশান্ত আবরণ নেমে আসতে দেখল। একটা হাসি ঠোঁটের উপব দিয়ে পিছলে চলে গেল।

"কাজটা খুইয়ে আফশোশ হচ্ছে?"

"অনেকগুলো টাকা তো! বাবাকে এক দিন বললুম, একবার গিয়ে খোঁজ নাও না যদি কাজটা আবার পাওয়া যায়। বাবা ফিরে এসে বলল, কাজ দেওয়া তো দূবের কথা, তোকে বাড়ি থেকেই বেরোতে বারণ করেছে। পুলিশও বাবাকে বলেছে আপনার মেয়ে কিন্তু খুব ডেঞ্জারে আছে। বাড়ি থেকে যেন বেরোয় টেরোয় না।... জানেন বাচ্চা বলেছিল নার্সিংহোমে আয়ার কাজ পাইয়ে দেবে। ওর মা আয়ার কাজ করে তো!"

প্রিয়ব্রত লক্ষ্য কবে যাচ্ছে। নিরুর মধ্যে চাপা উত্তেজনাব একটা প্রভাব কাজ করছে। তার জীবনেব জন্য অনেকেই ভাবছে। তারও যে একটা গুরুত্ব আছে এটা জানতে পারার বিস্ময ওর এখনো কাটেনি।

"প্রাণের মায়া তো সবারই আছে, তাই না?"

প্রিয়ব্রত মাথা নাড়ল। নিশ্চয়, সবারই আছে। সবাই বাঁচতে চায়। সে নিজেও চায় কিন্তু নিরুর মত করে নয়। তার পৃথিবীটা আরও ছড়ান, অনেক জটিল, অনেক কিছু নিয়ে জড়ান।

"বাচ্চাও কি তোমাকে— ?"

"না না, ও কিছু করেনি। ওই অমর আর গুলেই আমাকে...।"

"তাহলে পুলিশের কাছে তিনজনের নাম বললে কেন?"

"বাচ্চার নাম কেন যে বললুম!...ছেলেটা কিন্তু ভাল। তখন তো মাথার ঠিক

ছিল না। আর আমার জন্য কাজের চেষ্টা করবে না।" নিরু হতাশ চোখে তাকিয়ে রইল।

"তিলু।" প্রিয়ব্রত ডাকল। "একটা মোমবাতি দিয়ে যা। এই আলোটার বোধহয় তেল ফুরিয়েছে।"

নিরু মুখ পিছনে ঘুরিয়ে জানলার দিকে তাকাল। "এই ঘরটায় খুব হাওয়া আসে।"

"দক্ষিণটা অনেক দূর পর্যন্ত খোলা তো।"

নিরু উঠে গিয়ে জানলায় দাঁড়াল। মুখ গরাদে লাগিয়ে নীচে তাকিয়ে নিজেদের ছাদটা দেখছে। "ডাকলে শুনতে পাবে কি ?"

"না না, ডাকাডাকি কবতে যেও না। গলার আওয়াজ--ধারেকাছে কে কোথায় বয়েছে--জানলা থেকে সরে এস।" বলার পবই প্রিয়ব্রতর মনে হল, ধারেকাছে বলতে তো নীচের পগাড়টা। সেখানে এই অন্ধকারে নিরুর জন্য কে বা কাবা আব অপেক্ষা করবে ?

নিরুকে কাছাকাছি রাখাব, ওর মুখেব দিকে তাকিয়ে থাকার ইচ্ছে তার ভিতরে কখন যে তৈরী হয়ে উঠল, প্রিয়ব্রত সেটা হদিশ করতে পারল না। তার একটা যে কোন ধরণের ভরসা বা সমান স্তবের অনুভব কি এখন দবকার ?

জ্বলন্ত মোমবাতি পিতলের বাতিদানে বসিয়ে তিলু টেবিলে রাখল। ল্যাম্পটা নিয়ে সে বেরিয়ে যাবার সময় প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করল, আডচোখে নিরুর দিকে তাকাল। কেন তাকাল ? পিছনের বাড়ির মেয়েটাকে নিয়ে বাবু হঠাৎ কেন ঘরে এল, এটাই বোধহয় জানতে চায়, কিছু কি খারাপ উদ্দেশ্যের কথা ভাবছে ? ও কি জানে নিরু রেপড হযেছিল ? নিশ্চয় হিতুকে বলবে, 'বাবু একটা মেয়েকে নিযে এসে ঘরে বসে কথা বলছিল।' মেয়েটা যে পিছনেব বাড়িব, বাল্যবন্ধু খুদিকেলোব মেযে, সেটা হয়তো ইচ্ছে করেই চেপে যাবে। এটা ওটা হিতুর কাছ থেকে পায়। তিলু ওকে সব খবরই দেয়।

হিতু ছাদ থেকে নিরুকে কি আর দেখেনি ? হিতু কি জিজ্ঞাসা করবে, মেয়েটা কে ? বোধহয় করবে না। তাদের মধ্যে কথাবার্তা কচিৎই হয়। সকালে অফিসে যাবাব আগে যতটুকু সময়, তার মধ্যে দুচারটে দরকারি কথা শুধু বলা যায়।

"রোজ সকালে ভেজানো ছোলা খাওয়াটা ভাল। দু'দিন ধরে দেখছি পড়েই রয়েছে, খেযে নিস।"

"বাজারে দেখা হল ধীরুদার সঙ্গে। ওদের উঠোনে তোর মোটরবাইকটা বাখার কথা বললাম। ওপরটা ঢাকা, রোদবৃষ্টি লাগবে না। মনে হল, মাসে গোটা

তিরিশ টাকা পেলে রাজী হয়ে যাবে, কথা বলব ?'

'আজ বড় পিসিমার মেয়ে রাজুদি এসেছিল...আগে ওদের বাড়ি হয়ে। তোকে দেখবার খুব ইচ্ছে, এক দিন যাস না, টালা আর কতদূরই বা !'

নিরু ফিরে এসে আবার খাটে বসল। একই জায়গায়, একই ভাবে।

"আলো আসুক, আমি নীচে গিয়ে পগাড়ের দরজা খুলে তোমাকে পৌঁছে দেব।...তোমাদের দরজা ধাক্কালে শুনতে পাবে তো ?"

"পাবে। তবে কখনো তো কেউ ধাক্কায়নি, তাও আবার রাতে। ভয়টয় পেয়ে হয়তো খুলবে না।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। ভয় পাবার কারণ তো— ।"

প্রিয়ব্রত আবার তীক্ষ্ণ করল নজর। হাওয়ায় মোমবাতির শিখাটা বাঁকা হয়ে থরথর করছে। নিরুর মুখ ভয়ে না বিরক্তিতে লম্বাটে লাগল, সেটা ঠিক করতে পারল না। পরিস্থিতিটাই তার কাছে অবাস্তব লাগছে।

এক এক রবিবার দুপুরে গাঢ় ঘুমের পর ছাদে বেরিয়ে এসে শিথিলভাবে পাঁচিলে হাত রেখে দাঁড়িয়ে সে এই রকম অবাস্তবতার মধ্যে পড়েছে। আকাশ থেকে ধীর শান্ত আলো নেমে এসে উঁচুনিচু বাড়িগুলোর শ্যাওলা ধরা, পলেস্তরা খসে পড়া দেয়ালে জমে থাকে। টবের গাছ, ফুল, জানলার ফ্যাকাসে, পর্দা, অ্যান্টেনায় কাক, ভাঙা পাইপের পাশে অশ্বত্থ চারা, তারে ঝোলান কাপড়, কার্নিশে ঘুমন্ত বেড়াল, সব কিছুর মধ্যে আশ্চর্য এক সমাহিত মন্থর ভাব ! সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখতে দেখতে ধাঁধায় পড়ে। তার প্রতিদিনের জীবনকেই তখন অবাস্তব মনে হয়।

কিন্তু নিরুর মুখ আর মোমবাতির কাঁপা আলো পরিস্থিতিকে প্রকট করে তুলে সেটাকেই অবাস্তব পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়েটা কি ভয় পাচ্ছে না ? দু'শ টাকার ওপর রোজগার করে ও কি অন্য একটা জীবন দেখতে পেয়েছে ? সে নিজেও কি পঁচিশ বছর আগে এই রকম একটা জীবনের জন্য ফণী পালের হাতে নিজেকে তুলে দেয়নি ! প্রথমে তিনশো টাকা এখন সেটা হয়েছে পাঁচশো।

'প্রিয়, জিনিসপত্রের দাম বাড়ছে, তোমারও মাইনে বেড়েছে। তিনশোয় আর পারা যাচ্ছে না। কিছু বাড়াও।'

'কত ?' ভীত চোখে সে তাকিয়ে থেকেছিল।

ফণী পাল শুধু বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল দেখায়। আংটিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে সে মাথাটা হেলিয়ে আড়চোখে পাশের টেবিলে তাকায়। ভৌমিক মন দিয়ে একটা ফাইল থেকে চিঠি বার করায় ব্যস্ত ছিল। মন দিয়ে কিছু করলে

বুঝতে হবে ও কান দুটো সজাগ করে রেখেছে।

"আচ্ছা একটা কাজ করা যাক। আমিই বরং ডাকি। আমার গলা শুনলে ওরা বুঝতে পারবে না। তিরু, অরু, বরু···কার নাম ধরে ডাকব ?"

"ডাকাডাকির দরকার নেই। বাবা কি বলেছিল আমাকে নিয়ে যাবে এখান থেকে ?"

"না, তাতো কিছু বলেনি ! তবে বাড়ি ফিরে তোমায় না দেখলে কেলো নিশ্চয়ই এখানে খোঁজ করতে আসবে। তুমি কি বাবার জন্য অপেক্ষা করবে ?"

নিরু ইতস্তত করল। প্রিয়ব্রতর মনে হল, অপেক্ষা করতেই চায় কিন্তু কেলো যদি না আসে ! কিংবা অনেক রাত করে আসে ?

"তোমার বোধ হয় অস্বস্তি হচ্ছে।"

"না না, হচ্ছে না। আপনারই বরং হয়তো খারাপ লাগছে।···এমন একটা মেয়ে ঘরে বসে থাকলে— ।"

নিরু উঠে দাঁড়াল।

"এমন একটা মেয়ে বললে কেন ? কি এমন করেছ যে তোমায় আমি অন্যরকম ভাবব ? বোসো, আমি তোমাদের বাড়িতে গিয়ে, কালীমোহন মিত্তির স্ট্রিট দিয়েই যাব, বোনেদের কাউকে ডেকে পগাড়ের দরজা খুলতে বলি।"

"না থাক , আপনাকে মিছিমিছি বাবা ঝামেলায় জড়াল। আমি একাই যেতে পারব। যে জন্য এত ভয়, হয়তো দেখব সে সব কিছুই হয়নি। রাস্তায় কেউই আমার জন্য দাঁড়িয়ে নেই, শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছি।"

কথাগুলো শুনতে শুনতে প্রিয়ব্রতর মাথার মধ্যে রক্তের ঝলক লাগল। একটা সাঁই সাঁই আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছে। ছোটবেলায় বাবা-মার সঙ্গে পুরী গেছল। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পায়ের গোছ ডুবিয়ে দিয়ে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন পায়ের তলা থেকে বালি সরে যাওয়ার সিরসিরানিটা সে এখন আবার অনুভব করছে।

'শুধুশুধুই ভয় পাচ্ছি'···এই কথাটা শোনার জন্য সে বছরের পর বছর অপেক্ষা করে যাচ্ছে। ফণী পাল ছাড়া আর কেউ জানে না, জানবেও না। ফণী পাল অমর নয়, সত্তরের কাছাকাছি, একদিন মরবেই। 'যে জন্য এত ভয় হয়তো দেখব সে সব কিছুই হয়নি'···সে সসম্মানে রিটায়ার করে বেরিয়ে আসবে অতুলচন্দ্র ঘোষ হয়েই। শুধু নামটা আর বি-এ সার্টিফিকেটটাই অন্যের। তাছাড়া তার পরিশ্রম, বুদ্ধি, কাজ, আনুগত্য, নিয়ম মানা সবই তো নিজের।

"চলো আমি তোমার সঙ্গে যাব। দেখব সত্যি হয় কি না তোমার কথাটা।"

নিরু প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

"এইমাত্র যেটা বললে, শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছি। এক মিনিট।"

প্রিয়ব্রত পকেট থেকে চাবির রিঙ বার করে আলমারির পাল্লা খুলল। ন্যাপথলিদের গন্ধ বরাবরের মতই বেরিয়ে এল। খামে ভরা মাইনের টাকা বারবরই সে মঙ্গলার স্মৃতিমাখা বিবর্ণ দুটো সিল্কের রঙিন শাড়ির মাঝে ঢুকিয়ে রাখে। রাখার সময় বরাবরের মতই একবার সন্দিগ্ধ চোখে পিছনে তাকাল।

নিরু দেখছিল, চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল। মোমবাতিদানটা তুলে নিয়ে সে বলল, "চলো।"

সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে বলল, "তিলু বেরোচ্ছি, সদর দরজাটা বন্ধ করে দিসনি যেন, এখুনি ফিবব।"

মোমবাতি ধরা হাতটা তুলে সে ধীরেধীরে নামতে লাগল। দোতলায় সে দাঁড়াল। সিঁড়ির দরজার চৌকাঠটায় হোঁচট খাবার সম্ভাবনা আছে নতুন লোকের। ভাড়াটেদের দরজা বন্ধ। ভিতর থেকে বাসন রাখার শব্দ এল। অশোকবাবুরা তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়ে।

"তুমি আগে আগে নামো। আলোটা তাহলে পাবে। সিঁড়িগুলো ক্ষয়ে গেছে, দেখে দেখে না নামলে···তুমি আবার হাওয়াই চটি পরে। কাপড়টার কি হয়েছে দেখেছ কাদার ছিটে লেগে ?"

একতলা। ছোট উঠোনের পাশ দিয়ে সরু রক। উঠোনের এক দিকে দরজা, খুললেই পগাড়। রকের পাশে দুটো ঘর, তালা দেওয়া।

"ঘর দুটোয় কেউ থাকে না ?"

প্রিয়ব্রত দাঁড়াল। "এক সময় ভাড়াটে ছিল, এখন খালিই পড়ে আছে। ভাড়া আর দোব না।"

"কেন ?"

"এমনি। বাড়িতে লোক যত কম থাকে ততই শান্তি।"

সদর দরজার খিলে হাত রেখে, কি ভেবে প্রিয়ব্রত ঘুরে দাঁড়াল। "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। ঠিক ঠিক উত্তর দেবে ?"

নিরুর চোখে বিস্ময় ও উদ্বেগ ফুটে ওঠামাত্র প্রিয়ব্রত তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বলল, "তেমন কিছু নয়, এটাকে কৌতূহল বলতে পার।"

প্রিয়ব্রত পূর্ণদৃষ্টি ওর মুখের উপর রাখল। নিরু আঁচলটা কাঁধের উপর টেনে প্রায় অস্ফুটে বলল, "বলুন ?"

"কোর্টে যখন তোমায় শনাক্ত করতে বলবে, তুমি তখন কি করবে ?···ওদের

কি তুমি চিনিয়ে দেবে ?"

কথাটা বুঝে ওঠার জন্য নিরু কয়েক সেকেন্ড সময় নিল তারপরই ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা।

"কি করব ?"

"সেটাই তো জানতে চাইছি।"

"যদি বলি এই লোকগুলোই আমাকে—" গলা ভেঙে নিরুর কথা বন্ধ হয়ে গেল। ঢোঁক গিলে ফিসফিস করে বলল, "ওরা কি সত্যি সত্যিই আমাকে মেরে ফেলবে।"

"আজকাল যা অবস্থা হয়েছে, কোন লোককে মেরে ফেলাটা খুব শক্ত কাজ নয়। কাগজে রোজই তো দেখি মেয়েদের লাশ রাস্তার ধারে কি মাঠের এখানে ওখানে পড়ে থাকছে।"

"তাহলে কি করব ? মা বলছে পালিয়ে যা।"

নিরুর ব্যাকুল স্বরটা একতলার নোনা ধরা দেয়াল শুষে নিল। একটা আরশোলা মেঝে থেকে উড়ে দেয়ালে বসে শুঁড় নাড়াচ্ছে। কড়ি আর বরগাগুলোয় ঝুল, তাতে মোমবাতির আলোর কম্পন।

"এই তিনটে লোক কিন্তু সত্যিই সত্যিই আমাকে…আমি কিন্তু একটুও মিথ্যে বলছি না, আপনি বিশ্বাস করুন। আমার যে কি কষ্ট হয় ! মনে পড়লে এখনো আমি কাঁদি…আমি তাহলে কি করব ? আপনি বলে দিন না ?"

প্রিয়ব্রতর মনে হল এই অনুনয় তার কাছ থেকে পরামর্শ চেয়ে নয়, যেন জীবনভিক্ষা করছে। দুটি চোখ ধীরে ধীরে জলে ভরে উঠছে। মুখটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে নীচু হতে হতে পাশের দিকে ফিরিয়ে রাখল লজ্জায়। নিজের অসহায়তা নিরু বুঝতে পারছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়ব্রতও বুঝতে পারল সে নিজেও কত অক্ষম।

"তুমি পালিয়ে যাও। সত্যি কথা কোর্টে দাঁড়িয়ে বললে ওরা তোমাকে ছেড়ে দেবে না।"

প্রিয়ব্রত ঝুঁকে মুখের কাছে মুখ আনল তার ডান হাতটা আপনা থেকেই উঠে এসে নিরুর বাঁ কাঁধের উপর যেন বিশ্রাম নেবার জন্য রাখল। এতে কি মেয়েটি ভরসা পাবে ? কিংবা সাহস ?

"আপনি আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারেন ?"

"আমি ? কোথায় রাখব ?"

"এই ঘরে। যেমন তালাবন্ধ আছে ওইভাবেই থাকব।"

"পাগল হয়েছ !...চলো পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না। আপনি বলুন, এই ঘরেই আমি থাকব, থাকতে ঠিক পারব।"

হাতটা নিরু আঁকড়ে ধরেছে। সরু, দুর্বল আঙুল। কব্জিব উপরে ফুলে রয়েছে গাঁট। ঘেমে ওঠায় হাতেব লোম পাণ্ডুর চামড়ায় লেপটে, নাকের নীচেও বিজবিজে ঘাম।

"তা হয় না।"

"কেন হবে না ? এখানে থাকলে ওরা জানতে পারবে না, কোর্টে নিয়ে যাবার জন্য পুলিশও আমাকে খুঁজে পাবে না। কোর্টে না গেলে, বাবা বলেছে মামলা কেঁচে যাবে। ওবা ছাড়া পেয়ে গেলে আমি বেঁচে যাব।"

"হয় না হয় না, তুমি এখনো ছেলেমানুষ, ঠিক বুঝবে না অসুবিধেটা কোথায়। জানাজানি হবেই, তখন লোকে কি বলবে ? তুমি এখন বাড়ি চলো।"

কর্কশ হয়ে উঠল গলাটা, রুক্ষ শোনাচ্ছে, কিন্তু সে নিরুপায়। প্রিয়ব্রত দুঃখ পাচ্ছে ওব অবস্থাটা বুঝে কিন্তু সে কোনরকম সাহায্যই করতে পারবে না। ছেলেমানুষের কথা শুনে ছেলেমানুষী করা সম্ভব নয়। তাদের দুজনের বয়সের পার্থক্যের মত, জগৎও দুটো।

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সে খিল নামাল। জ্বলন্ত মোমবাতি হাতে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যায় না। ফুঁ দিয়ে নেবাবাব আগে সে নিরুর মুখের দিকে তাকাল। একদৃষ্টে তার দিকে নীরু তাকিয়ে। চাহনিতে কি যে রয়েছে প্রিয়ব্রত বুঝতে পারল না।

"সাবধানে পা ফেলে এসো।"

নীরুব হাত ধরল সে। অন্য হাতে নেবাল মোমবাতি। শব্দ না করে দরজা ভেজিয়ে দিল সন্তর্পণে।

যেন মরা মানুষের হাত। প্রিয়ব্রত আলতো টান দিল। চাকা লাগানো খেলনাব মত নিরু হাঁটছে। জেঠামশাইয়ের ঘরে উজ্জ্বল আলো। ইনভারটার ব্যাটারি গত বছর কিনেছে। বাড়িতে এমন একটা মেয়েকে লুকিয়ে রেখে দিয়েছে জানলে এই বাড়ির লোকেরা কি বলবে ? বুড়ো বয়সে একটা বৌ-মরা লোকের চরিত্র নষ্ট হওয়ার নমুনা হিসেবে পাড়ায় তাকে নিয়ে ফিসফিস আব হাসাহাসি হবে। অথচ কাউকে সে বলতে পারবে না আসল কারণটা।

গলি থেকে বেরিয়ে গুপি বসাক লেনে পা দিয়ে সে নিরুর হাত ছেড়ে দিল। এবার বাঁ দিকে যেতে হবে। রাস্তাটা তিরিশ মিটার গিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে পড়েছে কালিমোহন মিত্র স্ট্রীটে। মোড়ে একটা টিউবওয়েল, কয়লাব দোকান,

বাং-ঝালের দোকান আর একটা ছাপাখানা। আবার বাঁ দিকে তিরিশ মিটার গেলে নিরুদের গলি। কালীমোহন মিত্র স্ট্রীটের উপর সামনের বাড়িটা তার দোতলার নীচ দিয়ে সুড়ঙ্গের মত ভিতরে চলে গেছে গলিটা। এরই শেষে নিরুদের দরজা।

অন্ধকারে হুঁশিয়ার হয়ে হাঁটার জন্যই পিছনের বাড়ির গলিতে পৌঁছতে মিনিট দুই সময় লাগল। এই দু মিনিট তারা কথা বলেনি। প্রিয়ব্রতর সবকটি ইন্দ্রিয় নিবদ্ধ ছিল ভয় পাওয়ার মত ঘটনার সামনে পড়ার জন্য।

অন্ধকার ভাগ ভাগ হয়ে গেছে হারিকেন আর মোমবাতির আলোয়। কোন ভাগ থেকে একটি লোকও বেরিয়ে এসে তাদের পথজুড়ে সামনে দাঁড়াল না। প্রিয়ব্রত হাতের মুঠি শিথিল করল নিরুদের সুড়ঙ্গের মত গলিটার সামনে এসে। এরমধ্যে কেউ কি লুকিয়ে আছে ?

ছুরিটা তলপেটে ঢুকিয়ে ডাইনে কি বাঁয়ে টানবে। নরম নাড়ি ভুঁড়ির মধ্য দিয়ে ইস্পাতটা স্বচ্ছন্দে চলবে। তারপর টেনে বার করা। সাত কি আট সেকেন্ড বড়জোর লাগবে।

নিরু প্রথমেই চীৎকার করে উঠতে পারবে না। শকটা সামলে নিয়ে প্রথমে একটা গোঙানির মত শব্দ ওর মুখ থেকে বেরোবে। শ্বাস না টেনে চীৎকার করা যায় না। শ্বাস যতক্ষণে টানবে ততক্ষণে লোকটা ছুটে কিংবা হেঁটে গলি থেকে বেরিয়ে আসবে কিংবা আর একবার ফলাটা পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেবে।

"তুমি এবার কি যেতে পারবে, না দরজা পর্যন্ত সঙ্গে যাব ?" উদ্বিগ্ন স্বরেই কথাটা বলা উচিত কিন্তু প্রিয়ব্রতর নিজের কানেই স্বরটা স্বস্তি পাওয়ার মত ঠেকল।

নিরু সুড়ঙ্গটার দিকে তাকাল। অন্ধকারে ওর মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা নেবাবার আগে সে শেষবার নিরুর মুখ দেখেছে। মুখে কিছুই বলা ছিল না।

"আমি যেতে পারব।"

প্রিয়ব্রত তার দু'ধারের অন্ধকারের দিকে তাকাল। কেউ এগিয়ে আসছে না।

"তুমি নিরাপদে পৌঁছলে কিনা সেটা বুঝব দরজা বন্ধ করার শব্দে। শব্দ করে বন্ধ করবে, কেমন ?"

নিরু অন্ধকারে সুড়ঙ্গে ঢুকে গেল কথা না বলে, একবারও পিছনে না তাকিয়ে। প্রিয়ব্রত তাকিয়ে আছে কান সজাগ করে। কাঠের সঙ্গে কাঠের ধাক্কা

লাগার একটা শব্দ তার দরকার। তাহলেই সে নিশ্চিন্ত হবে। তার কর্তব্য, দায় থেকে সে মুক্তি পাবে।

সে অপেক্ষা করছে। নিজে একটা শব্দ তৈরী করে পাঠিয়ে দিলেই সে জেনে যাবে মিছামিছিই এই ভয়। 'হয়তো' দেখব সে সব কিছুই হয়নি শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছি।' তাই গড়িয়ে পঁচিশ বছর ধরে সে শুধু কিছু একটার জন্য অপেক্ষা করে গেছে। ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়েছে। এখন সে কেবল ফুরিয়ে যাওয়া ল্যাম্পটার থেকে আর বেশি কিছু না।

এইরকম কোটি লোক রোজ হাজার কলকাতায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। খাচ্ছে ঘুমোচ্ছে, সিনেমা দেখছে পাশা খেলছে, অফিস করছে, মদ খাচ্ছে, বেশ্যার কাছে যাচ্ছে, মন্দিরে পুজো দিচ্ছে, ছেলে মেয়েকে পড়াচ্ছে কর্তব্যকর্মেই জীবন যাপন করছে। কিন্তু তার মত ওরাও কি ধরা পড়ে যাওয়ার মত কিছুর অপেক্ষা করছে? ওরা যে আর ভাবতে না সেটা কি লুকোতে পেরেছে।

প্রিয়ব্রত অপেক্ষা করছে এতক্ষণে শব্দটা হয়ে যাওয়ার কথা। তাহলে কি ঠিক পৌঁছয়নি? মাঝপথে কেউ ওর মুখ চেপে ধরল নাকি? চমকে উঠল তার বুক। একবার ঘুরে দেখে আসবে নাকি আর একটু অপেক্ষা করবে? সোজা গিয়েই তো দেখবে। দিনের বেলা হলে এইখান থেকেই দেখা যেত।

"কাকে চাই আপনার?"

চমকে উঠে প্রিয়ব্রত মোমবাতিটা শক্ত করে ধরে দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল। তিন হাত দূরে একটা লোক। সাদা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরা। মাঝ বয়সী বলেই মনে হচ্ছে চাকের জন্য।

"এই গলির মধ্যের শেষ বাড়িটায় বাদিকেলোকে খুজতে এসেছি, কিন্তু যা অন্ধকার!"

"ওর একটা দর্জির দোকান।"

"হ্যা, হ্যা, জানি।"

"সেখানে যান, পাবেন।"

লোকটা নিঃশব্দে পিছনের বাড়িতে ঢুকে গেল। প্রিয়ব্রত আর অপেক্ষা করল না। সে ফিরে এসে নিজের সদর দরজাটা ঠেলে খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নৈঃশব্দ্য ভেঙ্গে এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে কথা বলার শব্দ ফুটে উঠল। লোডশেডিং শেষ। ইলেকট্রিক বালবের আলোয় কড়ি বরগা, ঝুল, কালি, নোনা ধরা দেয়াল আবার পরিচিত লাগছে। আপনা থেকেই সে হাতটা তুলে ঘড়িতে সময় দেখতে গিয়ে হাতের মোমবাতিটার দিকে প্রথমে তাকাল। আশ্চর্য লাগল তার, এতক্ষণ সে

এটাকে বয়ে বেড়াচ্ছে !

তিনটে ইংরিজি কাগজ এখন রাখা হচ্ছে । হিতু বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত সেগুলো তন্ন তন্ন করে পড়ে । কলিং বেলের শব্দ হবার আগে সে মোটরবাইকের এঞ্জিনের শব্দটার জন্য অপেক্ষা করে । বাইকটা বাড়ির গলির মধ্যে ঢোকান যায় না । হিতুর এক বন্ধু, তিনটে বাড়ি আগে থাকে । তাদের দরজাটা চওড়া, সেখানেই সিঁড়ির নীচে বাইকটা রাত্রে রেখে দেয় । বন্ধু জানিয়েছে, এত রাতে দরজা খুলে দিতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে তাই ধীরুদার উঠোনে রাখার ব্যাপারে হিতু তাড়াতাড়ি কথা বলতে বলেছে ।

প্রিয়ব্রত আজ আলো নিবিয়ে শুয়ে থাকল । কাগজটা পড়ার চেষ্টা করেছিল, পারেনি । বারবার তার চোখের উপর দিয়ে সারা দিনের কিছু কিছু ছবি সার দিয়ে চলতে থাকায় সে কাগজ রেখে দিয়েছে ।

অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত গলিটা থেকে একটা শব্দ পাওয়ার জন্য কেন সে উৎকণ্ঠিত হয়েছিল ? নিরুর নিরাপদে বাড়ি ফেরার প্রমাণ পাওয়া কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কাছে ? ওকে খুন বা হরণ করার জন্য অন্ধকারে ওৎ পেতে থাকার কি কোন দরকার হবে ? দিনেরবেলাতেই তো এসব কাজ এখন করা যায় !

করা যদি না হয় অর্থাৎ নীরু যদি পরশু পর্যন্ত বেঁচে থেকে কোর্টে হাজির হতে পারে তাহলে মেয়েটা সেখানে কি করবে ? ও কি নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করবে না ? সেটাই তো উচিত, স্বাভাবিক !

কিন্তু ওর মুখটা কেন স্বাভাবিক ছিল না ? মোমবাতির কাঁপা আলোর জন্যই কি সে পড়তে পারল না নিরুর চাহনির ভাষা ? প্রচণ্ড আতঙ্ক বা মরীয়া ভাব কি হতাশা থাকলেই স্বাভাবিক হত, কিন্তু কিছুই ওর চোখে বলা ছিল না । ভিতরের শূন্যতা কি চোখ দিয়ে ফুটে ওঠে ? এতগুলো বছর কত লোক তার চোখের দিকে তাকিয়েছে কিন্তু কেউ তো ইঙ্গিতেও তাকে জানায়নি : 'তোমার ভেতরে মনে হচ্ছে আর কিছু নেই.' 'আপনার মধ্যে কেমন যেন খালি খালি ভাব দেখা যাচ্ছে !'

মোমবাতিটা নেবাবার পর নিরুর মুখ আর সে দেখার সুযোগ পায়নি । প্রিয়ব্রত বার বার মনে করার চেষ্টা করল । প্রোজেক্টারে দেখান স্লাইডের মত মুখটা বার বাব সবে যাচ্ছে । ধাবা বর্ণনার মত ওর কথাগুলোও সেই সঙ্গে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে সরে যাওয়া মুখের সঙ্গে ।

'দুখা হত, কষ্ট হত, ছত্রিশ দিনের রোজ পেয়েছিলুম ।'

'প্রাণের মায়া তো সবারই আছে, তাই না ?'

'যে জন্য এত ভয়, হয়তো দেখব সে সব কিছুই হয়নি !'

'তাহলে কি করব ? ওরা কি সত্যি সত্যিই আমাকে মেরে ফেলবে ?'

'আপনি আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারেন ? ওরা ছাড়া পেয়ে গেলে আমি বেঁচে যাব !'

না, তোমাকে আমি লুকিয়ে রাখতে পারব না। দিনের পর দিন কোন মানুষের পক্ষে তালা বন্ধ ঘরে থাকা সম্ভব নয়। ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ ! এভাবে বেঁচে থাকা যায় না।

প্রিয়ব্রত বিছানায় পাশ ফিরল। পাখা ঘুরছে তবু ঘামে সপ সপ করছে চাদর, বালিশ। বাইকের ক্ষীণ শব্দের জন্য সে কান পাতার চেষ্টা করল। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কুয়াশার মত ঘুম ছড়াচ্ছে তার চেতনায়।

ছাব্বিশ বছর ধরে তার বুকের মধ্যে তালা বন্ধ রয়েছে একটা লজ্জা, একটা অপরাধ। সেটা কুরে কুরে তার সুখ, আনন্দ, সাহস, স্বাচ্ছন্দ্য খেয়ে নিয়েছে। তালা ভেঙ্গে তাকে হিড়হিড় করে টেনে বার করে নিয়ে যাচ্ছে, এমন একটা দৃশ্য বহুবার সে কল্পনা করেছে আর ভয়ে শিউরে উঠেছে।

'শুধু শুধুই ভয় পাচ্ছি' !

বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিরুদের গলি পর্যন্ত নির্বিঘ্নেই তো যাওয়া গেল। এইভাবে সেও তো পঁচিশটা বছর পার হয়ে এল, সিকি শতাব্দী ! এইভাবে বাকি পথটাও কি যাওয়া যাবে না ? নিজেকে ছাই করে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে...লক্ষ লক্ষ মানুষ তো এইভাবেই রাস্তা ধরে ছাই গাদার দিকে হেঁটে চলেছে !..শুধু ফণী পালই একটা জ্বলন্ত কয়লা হয়ে রয়েছে !

আজই প্রথম ফণী এল না। কিছু একটা হয়েছে বোধহয়। হোক্। সারা রাত সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে ফণী পাল ট্রাম থেকে নামার সময় পড়ে গিয়ে যেন চাকার তলায় চলে যায়। তার ডাকে ভগবান তিনকড়িকে ট্রামের তলায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এবারও নিশ্চয় শুনবেন।

কিন্তু তিনকড়ি কেন হঠাৎই বেঞ্চে তার জায়গাটায় বসতে চেয়েছিল ? আজও সেটা তার জানা হয়নি !

স্বদেশ বলল না তো বাহাদুর শা জাফর কত তম মোগল বাদশা ছিল ? কাল অফিসে গিয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করতে হবে।..না থাক্। ছেলেটা বড্ড খবর রাখে।

'বুঝলেন অতুলদা, যত রাজ্যের লুকোন খবর, হাঁড়ির খবর, গোপন ব্যাপার...'

অতুলদা অতুলদা ।

নিরুর মুখে একটা সাদা কাগজ আঁটা ছিল। তাতে কি খবর ছিল, তা সে কোন দিনই জানতে পারবে না। এই সব কাগজে মুহূর্তের জন্য কথা ফুটে ওঠে আর মিলিয়ে যায়।

সুড়ঙ্গের মত গলির অন্ধকারে নিরু ঢুকে গেল। কাঠের সঙ্গে কাঠের ধাক্কা লাগার শব্দ এবার আসবে আসবে আসবে।

ঘুমিয়ে পড়ার আগে প্রিয়ব্রত বাঁ হাতটা উরুর উপর তুলে দিল।

॥ ৩ ॥

"দাদা কাল কখন ফিরল রে?"

"অনেক রাতে, প্রায় বারোটায়।"

"নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিলিস আর দাদা বেল বাজিয়ে যাচ্ছিল।" তিলু মাথা নুইয়ে জবাব দিল না।

"দাদাকে খেতে দিয়েছিলি?"

"খেয়ে এসেছে বলল। খাবে কি, যা গন্ধ বেরোচ্ছিল মুখ থেকে!"

গন্ধ! প্রিয়ব্রতর স্নায়ুগুলো বুকের কাছে কেউ টেনে ধরল। মুখে গন্ধ বললে তো একটাই মানে হয়।

"কে বলল গন্ধ?" সে ধমকে উঠল। "কি আবোলতাবোল বকছিস?"

তিলু ন্যাতার জল নিঙড়ে বালতিতে ফেলছে। গম্ভীর চোখে একবার তাকিয়ে বলল, "কল-ঘরে গিয়ে বমিও করেছে। আমি ধরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলুম।"

বেরিয়ে গেল তিলু। প্রিয়ব্রত খাটে বসে মাথা নামিয়ে রাখল। ঝিম ঝিম করছে শরীর। শেষকালে তার কপালেই এমনটা ছিল। মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে হিতু মদ ধরল! এই তো সেদিন স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট জেনে এসে তাকে প্রণাম করল। ফার্স্ট ডিভিশন! 'মা'কে প্রণাম কর হিতু। ওর আশীর্বদ নে।' হিতু কতক্ষণ ধরে ছবিটায় মাথা ঠেকিয়ে রেখেছিল! ওর এগারো বছর বয়সে মা মারা যায়।

মঙ্গলার ছবির দিকে তাকিয়ে প্রিয়ব্রতর চোখ জলে ভরে এল। সেই হিতু এখন চাকরি করছে, মদ খাচ্ছে। একই সঙ্গে সে বাবা আর মায়ের ভূমিকা পালন করেছে। বিয়ে করার চাপ প্রত্যাখ্যান করেছে মা-মরা ছেলের মুখ চেয়ে।

'বাবা দুশো টাকা দাও তো, জুতো কিনব।'

অ্যাতো টাকার জুতো! কিন্তু কথাটা সে মুখ থেকে বার করতে পারেনি। শুধু

বলেছিল, 'ফরেন জুতো ?'

গীটার কিনব, জিনস্ কিনব, টেপ রেকর্ডার কিনব, দার্জিলিং যাব প্রশ্ন না করে সে হিতুকে খুশিতে রাখার চেষ্টা করে গেছে। খুব ভাল ছাত্র ছিল। চমৎকার ইংরিজি লেখে।

প্রথম ওর মুখে সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিল কবে ? প্রিয়ব্রত মনে করার চেষ্টা করল : পাঁচ বছর আগে মঙ্গলার মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে। ওই দিনটায় সে উপোস করে। ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র হিতু বলেছিল, 'তোমার গ্যাস্ট্রিক আছে, নিজের শরীরটা আগে দেখো। না, না, সেন্টিমেন্টে আঘাত আমি মোটেই করছি না, এসব আমি বুঝি, কিন্তু সব কিছুর একটা প্র্যাক্টিকাল দিকও তো আছে ?'

হিতু তখন থেকেই এসব বোঝে ! কি মনে করে 'এসব' কথাটা বলেছিল ? মায়ের প্রতি বাবার ভালবাসা, অনুগত্য এটা ওর কাছে জীবনের আনপ্র্যাক্টিক্যাল দিক।

কথা বলার সময় ওর মুখ থেকে সিগারেটের গন্ধ পেয়েছিল। তাতে যতটা সন্ত্রস্ত হয়েছিল তারও বেশি অবাক হয়েছিল ওর বয়স্কতা দেখে। কবে এত বড় হয়ে উঠল যে প্র্যাক্টিক্যাল দিক দেখার চোখ খুলে গেছে ! মুখের ওপর বাবাকে সমালোচনা করার জোর পেল কিভাবে ? তখন সে বলতে পারত, নিজের চরকায় তেল দাও হিতু, আমাকে আমার কাজ করতে দাও।

বলতে পারেনি। ভয় হয়েছিল, একমাত্র ছেলেটা তাহলে দূরে সরে যাবে। হিতু কখনো তাকে অসম্মান, অবহেলা করেনি। হাসিখুশি, আমুদে কিন্তু চট করে রেগেও ওঠে। তর্ক করার ঝোঁক ছোট থেকেই। প্রিয়ব্রত ওকে বরাবর প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে দেওয়াটা উচিত হয়নি। কিন্তু এখন ও শাসনের বাইরে নিজের এলাকায় চলে গেছে।

"বাজার যাবেন না ?" দরজায় দাঁড়িয়ে তিলু। "আটটা তো বাজে !"

"শরীরটা খারাপ লাগছে, বাজারে আর যাব না। নিরিমিষেই চালিয়ে দে। অফিসেও যাব না।"

"আপিস কামাই দেবেন !"

তিলুর অবাক হওয়ারই কথা। তার থেকেও অবাক হবে ভৌমিক। সে তার চাকরি জীবনে কখনো অতুল ঘোষকে ক্যাজুয়াল নিতে দেখেনি।

"হ্যাঁ কামাই দোব, কেন দিতে পারি না ?" তার তীব্র স্বর তিলুকে সরিয়ে দিল দরজা থেকে।

আজ সে একটু অন্যরকম হবে, প্রতিদিনের ছাঁদটা বদলাবার চেষ্টা করবে।

বাজার করা, বাসে ওঠা, অফিস যাওয়া, আবার বাসে উঠে বাড়ি ফেরা, আজ বন্ধ রাখবে। হিতুকে আজ সে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেবে—।

কিন্তু কি জানাবে?

প্রিয়ব্রত ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। রান্নাঘরটা তার শোবার ঘরের মুখোমুখি। তিলু পিছন ফিরে বাটনা বাটছে। বাঁ দিকে হিতুর ঘর। পর্দা ঝুলছে খোলা দরজায়। শিলে নোড়া ঘষার শব্দ ছাড়া বাড়িটা নিঃসাড়। হিতুর ঘরের পাশেই ছাদে যাবার দরজাটা খোলা। দুটো চড়াই ছাদে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

একহাতে পর্দা সরিয়ে সে উঁকি দিল। উবুড় হয়ে হিতু ঘুমোচ্ছে। মাথাটা বাঁ দিকে ঘোরান। খালি গা। পরনে শুধু দিনের প্যাণ্ট।বালিসটা বুকে জড়িয়ে ধরা। ধীর লয়ে ওঠানামা করছে পিঠ। দুই বগলের চুল দেখা যাচ্ছে। ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত মেরুদণ্ড বেয়ে একটা খাত, তার দুপাশে মসৃণভাবে ছড়ান পিঠের পেশী সামান্য উঁচু হয়ে গড়িয়ে পড়েছে পাঁজরের দিকে। কোমরটা কাঁধের থেকে সরু। পা দুটো ছড়ান। প্রিয়ব্রত একদৃষ্টে ছেলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরে ফিরে তিনটে খবরের কাগজের একটা তুলে বিছানায় আধশোয়া হল।

তার চোখ রয়েছে কাগজে কিন্তু একটা হেডিংও মগজে আটকাচ্ছে না। হিতু এখন পূর্ণ যুবক। রোজগার করছে। এখন সে নিজের ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। .....শুধু রাজনীতির খবর। ভারতের প্রধানমন্ত্রী, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, তাঁরা কি বলল.....সেই একঘেঁয়ে বস্তাপচা চল্লিশ বছরের পুরনো কথাগুলোই উল্টেপাল্টে নতুন ঢঙে বলা।.....রিপোর্টারের কাজটা কি ধরনের? খবরটা কি ওর লেখা? মদ খেয়ে কি কাজ করা যায়? হিতু নিশ্চয় ছুটির পরই খেয়েছে। একা, না সঙ্গে আরো কেউ ছিল?

হাউসওয়াইফ পুড়ে মরেছে! এই এক বৌপোড়ানোর ধূম লেগেছে সারা দেশে। এই গোপী বসাক লেনেই তিনটে বৌ গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে ছিল। তিনজনই বাঁচেনি। তাদের একজন ছিল তার বন্ধু কার্তিকের মা। তখন সে ক্লাস ফাইভে পড়ে। কবেকার কথা! সে খবর কি কাগজে বেরিয়েছিল? ....এই কি প্রথমবার খেল নাকি নিয়মিতই খাচ্ছে? রোজ খেলে এতদিনে সে ধরে ফেলত। নিশ্চয় কেউ ওকে ধরিয়েছে। কে সে লোকটা? হিতু কি তাকে হিতৈষী ভাবে? কার্তিকের বাবার শোভাবাজারে রেডিমেড জামাকাপড়ের দোকান ছিল। রাতে দোকান বন্ধ করে কোথায় যেন গিয়ে মদ খেত আর বাড়ি ফিরে বৌকে ঠ্যাঙাত। হিতুও কি ঐরকম হবে?

প্রিয়ব্রত অস্বস্তি ভরে কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে জানলায় তাকাল। স্বচ্ছ আকাশ, মেঘের আঁচড়টুকুও নেই। কে জানে দুপুরে মেঘ হয়ে বিকেলে আবার ঝড়বৃষ্টি হতে পারে।...কার্তিকের বাবার মত হিতু অশিক্ষিত নয়। তা ছাড়া ওর বৌ নিশ্চয় কার্তিকের মায়ের মত ছুঁচিবেয়ে কদাকার হবে না। বাড়ির মানমর্যাদার কথাও নিশ্চয় হিতু ভাবে।...'মাইনর গ্যাং রেপড'!'

হাতটা শক্ত হয়ে উঠল। প্রিয়ব্রত কাগজটা বিছানার উপর মেলে কাত হতে হতে মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে নিল। নোংরা বিষয়ের খবর পড়ার সময় সে চায় কেউ যেন তার পড়াটা দেখে না ফেলে।

"কে?" প্রিয়ব্রত চমকে মুখ ফেরাল।

"একটা কাগজ দেবে?" দরজায় হিতু দাঁড়িয়ে। চোখেমুখে জল দিয়েছে, বুকটা ভিজে, চোখ দুটো ফুলে রয়েছে।

"কোনটা নিবি?"

"মেইলটা দাও। এক মিনিট দেখব।"

হিতু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে চেয়ারে বসল। একেবারে চারটে পাতা উল্টেই কি যেন খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ল।

"তোর কোনো লেখা?"

বোধহয় শুনতে পায়নি। বরাবর এইরকমই, কিছু পড়তে শুরু করলে সেঁধিয়ে যায় লেখার মধ্যে। একবার পড়লেই মনে রাখতে পারে বলে পড়ার টেবিলে ওকে বেশিক্ষণ বসতে দেখা যেত না। প্রিয়ব্রত আর একটা কাগজ তুলে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগল।

"এই নাও.....দেখি ওটা দাও তো।"

প্রিয়ব্রত আর একটা কাগজ এগিয়ে দেবার সময় বলল, "তোর লেখা আজ বেরিয়েছে?"

"হুঁ, রোজই বেরোয়।"

হিতু আবার কাগজে ডুবে গেল। এই সব খবর কি ও লেখে? প্রিয়ব্রত আবার জানলার দিকে তাকাল। নিরু এখন কি করছে! ক'খানা ঘর নিয়ে ওরা থাকে? অতগুলো বোন, মা, বাবা, চলাফেরার জায়গা কোথায়? কারুর বাড়িতেও যাওয়ার উপায় নেই। আছে শুধু ছাদটা। ও কি এই রোদের মধ্যে ছাদে এসে বসে আছে?

মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছে অথচ হিতুর মুখে কোন গ্লানি নেই। ওকে বারণ করলে কি খাওয়া বন্ধ করে দেবে? যদি বলি আমি কষ্ট পেয়েছি, ভয় পেয়েছি

তা হলে কি বাবার মুখ চেয়ে---এটা কি খবর ! প্রিয়ব্রত কাগজটা তুলে চোখের কাছে টেনে আনল।

"হিমালয়ান ফ্রড বাই ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট।" প্রিয়ব্রত বিড়বিড় করে হেডিংটা পড়ল। সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূবিজ্ঞানের অধ্যাপক জন ট্যালেন্ট জানাচ্ছেন, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ গুপ্তা কাল্পনিক ফসিল আবিষ্কার করে তারই সাহায্যে উত্তর ভারতের ভূপ্রকৃতির ইতিহাস নতুন করে লিখেছেন। যেসব নমুনার উপর ভিত্তি করে লেখা, তা ফসিলের দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া ওগুলো প্রায়শই কুড়িয়ে পাওয়া যায় যুক্তরাষ্ট্রে, ইওরোপের কিছু জায়গায়, চীনে এবং অন্যত্রও।

প্রিয়ব্রতর ঘাড়ের কাছটায় সিরসির করে উঠল। তার মনে হচ্ছে খবরটার মধ্যে এক ধরনের বিপদ তার জন্য অপেক্ষা করছে। আর পড়বে না স্থির করে কাগজটা নামিয়ে রাখতে গিয়েও রাখল না। দুর্নিবার একটা আকর্ষণ তার চোখ টেনে নিয়ে গেল অক্ষরগুলোর উপর।

প্রোফেসার গুপ্তা জানিয়েছিলেন তিনি নাকি হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ফসিল আবিষ্কার করেছেন। উঁচু পর্বতমালার জন্য সেখানে খুব কম বিজ্ঞানীরই পৌঁছন সম্ভব। প্রোফেসর ট্যালেন্ট বলেছেন, ফসিলের অধিকাংশ নমুনাই 'সাধারণ লেবরেটরি শিলা'। তিনি আরও বলেছেন, প্রোফেসর গুপ্তার গবেষণা সম্পর্কে প্রথম তার সন্দেহ জাগে আঠারো বছর আগে যখন তিনি গ্র্যাপটোলাইট, খুদে সামুদ্রিক ফসিল বিষয়ে একটি রিসার্চ পেপারে জানালেন, এই ফসিলগুলো তিনি কাশ্মীরের একটা জায়গা থেকে পেয়েছেন। প্রোফেসর ট্যালেন্ট সেই জায়গাটায় ঘুরে এসে বলেন, 'গিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। স্থানটি এমনই যে সেখানে গ্র্যাপটোলাইট কেন, কোন ধরনের ফসিলই কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যাপারটা নিয়ে তখন কিছু বলিনি। ভেবেছিলাম তঞ্চকতাটা আপনা থেকেই ফাঁস হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রমশ জিনিসটা এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছে, এত বেশি ভুল খবর জমে উঠেছে যে এখন আমাদের গবেষণার ফল ঠিক না ভুল সেটা বোঝাই দায় হয়ে পড়েছে, পুরো ডাটাই মিথ্যাচারে ভরা। ভারতীয় এবং বিদেশী বিজ্ঞানীরা বোকা বনেছেন। গুপ্তার রিসার্চ পেপারের বিদেশী সহ-লেখকরা গবেষণার জন্য ফসিলগুলো হিমালয় থেকে পাওয়া বিশ্বাস করেছিলেন। তারা একটুও সন্দেহ করেননি, যে ফসিলগুলো তারা বর্ণনা করছেন সেগুলো তাদেরই খিড়কি দিয়ে এসেছে। হয়তো এসেছে তাদের নিজেদের লেবরিটরি ঘুরেই। রিও-তে রাইনো বা কাশ্মীরে ক্যাঙ্গারু পাবেন কি, যদি না

সেগুলো কোন চিড়িয়াখানা থেকে বা ভ্রাম্যমান সার্কাস থেকে পালিয়ে সেখানে গিয়ে থাকে ?'

প্রিয়ব্রত অবাক হল এই ভেবে যে প্রায় ষাট জন বিজ্ঞানী নিজেদের অজান্তেই এই জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েছে ফসিলের নমুনা পরীক্ষায় আর পেপারের সহ-লেখক হতে রাজী হয়ে। ইতিহাসের এটা নাকি বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক জালিয়াতির একটা! অথচ এই প্রোফেসর গুপ্তার ভাবতীয় ভূতত্ত্ব বিষয়ে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বই আর শ' চারেক পেপার আছে! একদিনেই ব্যাপারটা হয়নি, বহু বছর ধরেই এটা তা হলে চলে আসছে।

কতদিন ধরে গুপ্তার জালিয়াতিটা চলছে জানার জন্য প্রিয়ব্রত খবরটার শেষের দিকে খুঁজতে গিয়ে এই কথাটা পেল। প্রোফেসর গুপ্তা গত পঁচিশ বছর ধরে তার কেরিয়ার তৈরী করেছেন মোচড়ান, দোমড়ান, জট পাকানো মিথ্যা খবরের ভিতের উপর। পঁচিশ বছর ধরে অজস্র ভুল সংবাদ যথেচ্ছ ঢেলে গেছেন, কেউ তাকে ধরতে পারেনি।

সে চাকরি করছে ছাব্বিশ বছর। গত মাসে পঁচিশ পূর্ণ হয়ে গেল। কাগজধরা হাতটা অবশ হয়ে নেমে এল তার কোলে।

এই বিশ্বাসেই গুপ্তা কি কখনো ভেবেছিল হাজার হাজার মাইল দূরে অস্ট্রেলিয়ার টালেন্ট নামে একটা লোক আঠারো বছর আগে প্রথম তাকে সন্দেহ করে। ভারতে এসে ফসিল পাওয়ার জায়গাটা ঘুরে দেখে যায়। নিঃশব্দে অপেক্ষা করেছে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য।

কেউ কি আঠারো বছর আগে গোপী বসাক লেনে এসে এই বাড়িটা দেখে গেছে? কেউ কি অপেক্ষা করছে তার জন্য!

তাহলে এতদিনে ঝাঁপিয়ে পড়তই। কেউ জানে না একমাত্র ফণী পাল ছাড়া। ওর মুখ সে বন্ধ করে রেখেছে মাসে মাসে পাঁচশো টাকা দিয়ে। ফণী পাল তাকে ধরিয়ে দেবে না যতদিন টাকাটা পাবে।

এত বছর পর তাকে ধরিয়ে দিয়ে কার কি লাভ হবে? সে তো কোন ভুল বা মিথ্যা খবর ঢেলে দেয়নি! যতটা গুটিয়ে থাকা একটা মানুষের পক্ষে সম্ভব সেই ভাবেই ছাব্বিশটা বছর কাটিয়ে এসেছে। কখনো কারুর বিন্দুমাত্র ক্ষতি করেনি, নিজের কাজ অন্যের ঘাড়ে চাপায়নি, প্রোমোশনের জন্য চেষ্টা করেনি। আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী সবার থেকে সরে গিয়ে নিজস্ব একটা জগৎ সে গড়ে ফেলেছে।

নিজেকে ঘিরে খোলস বানিয়েছে। সেটাকে প্রতিদিন সে কঠিন করে তুলেছে

নিজেকে ভয় পাইয়ে। চেতনা, স্নায়ু, দৃষ্টি, স্বরনালী এমনকি পদক্ষেপও সে একই সূত্রে ভয়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। বাইরে থেকে কোন তাপ, আলো, শব্দ, বাতাস, হাসি সেই আবরণ ভেদ করে ঢুকতে পারেনি। এটাই তার বড় কৃতিত্ব, কাউকে এত বছর ধরে জানতে দেয়নি সে অন্য জগতে বাস করে।

কিন্তু কেউ কোথাও অপেক্ষা করছেই। বিশ্বজিত গুপ্তার মত বিজ্ঞানী পঁচিশ বছর পর যদি ফেঁসে যেতে পারে তাহলে ছাব্বিশ বছর পর একটা আপার ডিভিশ্যন ক্লার্কও ধরা পড়তে পারে। গুপ্তা বলেছে 'পেশাগত ঈর্ষা' থেকে তার সম্পর্কে এইসব বলা হয়েছে, সে মামলা করবে।

তাকে কেউ ঈর্ষা করে না।

সে মামলা করার কথা ভাবতেই পারে না।

ধরা পড়লে চাকরি অবশ্যই যাবে। কিন্তু আর কি হতে পারে? প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা নিশ্চয় দেবে না। ছব্বিশ বছরের মাইনের টাকা কি ফেরৎ চাইবে? জেলে পাঠাবে কি? চাকরির নিয়মকানুনে এই রকম ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে কোন শাস্তির কথা বলা আছে কি না তা সে জানে না। জানতে গেলে কৌতূহল তৈরী হতে পারে ভেবেই সে অফিসে কখনো খোঁজ নেয়নি। বিশ্বজিত গুপ্তার জেল বা জরিমানা নিশ্চয় হবে না।

লোকটা এখন কেমন আছে? তার পরিবারের লোকেরা কি ভাবছে? মামলায় যদি হেরে যায়? ...কাল নিরুকে কোর্টে যেতে হবে। প্রিয়ব্রত জানলার দিকে তাকাল। জানলার কাছে গেলে তবেই ওদের ছাদটা দেখা যায়। যাবে কি?

মুখ ফিরিয়ে দেখল হিতু নেই। নিঃসাড়ে কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। সে খাট থেকে উঠে জানলার কাছে গেল। নিরুদের ছাদে মানুষ নেই। এককোণে ভাঙ্গা চুবড়ি আর কাপড়ের টুকরো পড়ে রয়েছে। কান পেতেও কথার টুকরো বা বাসনের শব্দ পেল না।

"তিলু চা করছিস নাকি?" প্রিয়ব্রত ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে অনুচ্চ স্বরে বলল।

"দাদার জন্য জল বসিয়েছি, আপনি খাবেন?"

"হ্যাঁ।"

হিতুর ঘরের পর্দা টান হয়ে ঝুলছে। ঘর থেকে শব্দ আসছে না। দরজার কাছে এসে প্রিয়ব্রত পর্দায় হাত রেখে বলল, "একটা কথা বলব তোকে।"

সেকেন্ড পাঁচেক পর, "ভেতরে এসো" শুনে সে পর্দা সরাল। হিতু চিৎ হয়ে

একটা ইংরেজি বই পড়ছে। খাটের নিচে অ্যাশ ট্রে থেকে ধোঁয়াটা হিতুর কানের পাশ দিয়ে উঠছে। বাবার গলা শুনে সিগারেট নিবিয়েছে। প্রিয়ব্রত স্বাচ্ছন্দ্য ও ভরসা পেল।

"মোটরবাইক চালানোটা কলকাতার রাস্তায় খুবই রিস্কি। তার উপর রাতে তো রাস্তায় আলো বলতে কিছুই থাকে না।"

সে প্রতিক্রিয়া দেখতে চায়। কিন্তু হিতুর চোখ বইয়ের পাতা থেকে সরল না। তাহলে কি ও বুঝতে পেরেছে, বাবা আসলে কি কথা বলতে এসেছে?

"যথেষ্ট বড় হয়েছিস, নিজের সেফটি সম্পর্কে আরো নজর দিতে শেখ। মোটরবাইক চালানো এমনিতেই বিপজ্জনক ব্যাপার, তার ওপর ফুল কন্ট্রোল না থাকলে—"

"কাল আমার ফুল কন্ট্রোল ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে।"

হিতুর স্বর তীব্র, চোখে অধৈর্যের বিরক্তি।

"যারা অ্যাকসিডেন্ট করে তারাও এইরকম ভাবত।"

"আমি এমন কিছু ড্রিঙ্ক করিনি যাতে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।"

প্রিয়ব্রত আহত হল এত স্পষ্ট করে, বিনা ভণিতায় 'ড্রিঙ্ক' শব্দটা ওর মুখ থেকে বেরিয়ে আসায়। ও তাহলে ধরেই রেখেছিল বাবা এই নিয়ে কথা বলতে আসবে। উত্তরও তৈরী করে রেখেছে।

"ড্রিঙ্ক করাটা এমনই জিনিস, এটা দিনদিন বাড়ে।·· তুই ড্রিঙ্ক করে আর মোটরবাইক চালাসনি।"

"অ্যাকসিডেন্টের ভয়ে?"

হিতুর দৃষ্টিতে বিদ্রূপ, চ্যালেঞ্জ। চোখ ক্রমশ সরু হয়ে আসছে, ঠোঁট দুটো মুচড়ে চেপে ধরা। রাগ চাপার সময় ওর মুখটা এইরকম হয়।

"কাল যে মেয়েটা এসেছিল সে কে?"

প্রিয়ব্রত পাথর হয়ে গেল প্রশ্নের আকস্মিকতায়। সাড় ফিরে আসামাত্র বুকটা দুরদুর করে উঠল। হিতুর প্রশ্নে কিসের ইঙ্গিত! কি বলতে চায়, কি ভেবে নিয়েছে?

সে জানত তিলু ওকে চুকলি কাটবেই। যেমন ওর বমি করার কথাটা তাকে বলে দিয়েছে। হিতু জানুক কাল একটা মেয়ে তার ঘরে বসে কথা বলেছে, তাকে বাড়ি পর্যন্ত সে পৌঁছেও দিয়ে এসেছে। কিন্তু এইভাবে বলা প্রশ্নটার মধ্যে অশ্লীল কদর্যতার ছাপ রয়েছে। বাবার সঙ্গে এইভাবে কথা বলার মানসিকতা ও পেল কবে? কৈফিয়ৎ চাইছে কি?

"পেছনের বাড়ির নিরু, খুদিকেলোর বড় মেয়ে। ...মেয়েটা আটমাস আগে রেপড হয়েছিল। পুলিস কেস চলছে।"

হিতুর মুখে কোন ভাবান্তর ঘটছে না। যেন তার জানা ঘটনা। কাগজে কাজ করে অনেক কিছুই হয়তো জানে।

"রেপড হয়েছে তো কি হয়েছে, গণ্ডা গণ্ডা মেয়েই হচ্ছে, তাই বলে এখানে এল কেন?"

"ওকে থ্রেট করেছে খুন করবে বলে। কোর্টে আইডেন্টিফাই যাতে না করে সেজন্য। ওরা বাড়িতে এসে ওকে ছুরি দেখিয়ে শাসিয়ে গেছে, খুদিকেলোকেও বলেছে দোকান বোমা মেরে জ্বালিয়ে দেবে!"

প্রিয়ব্রতর স্বর ধাপে ধাপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সে নিজেও সেটা বুঝতে পারছে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল না। স্বর চড়ে ওঠে তো চড়ুক। ব্যাপারটার গুরুত্ব তার কাছে কতটা এটা হিতুকে বোঝাতে হবে।

"এখন ওদের মনের অবস্থাটার কথা ভেবে দ্যাখ!"

"দেখেছি।" বই মুড়ে রেখে হিতু দুটো হাত মাথার পিছনে ছড়িয়ে দিল, অলস শ্লথ ভঙ্গিতে। "ছুরি দেখাক কি বোমা মারুক তাই নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কেন? কলকাতায় এসব তো রোজই ঘটছে। তোমার কি সময় কাটাবার আর কিছু নেই?"

"গরীব ওরা, মেয়েটাও ছেলেমানুষ—"

"কত ছেলেমানুষ? বয়স কি ছয়, সাত আট? তিনজন রেপ করেছে যাকে সে কি ছেলেমানুষ? আর ওকে নিয়ে তুমি—।"

"ওকে নিয়ে আমি কি?"

প্রিয়ব্রত হাত বাড়াল চেয়ারের পিঠটা ধরার জন্য। মুখ ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, হাতের আঙুলের কাঁপুনি থামাতে মুঠো করল। হিতু তাকে লক্ষ্য করছে দেখে স্বাভাবিক দেখাবার চেষ্টায় সে চেঁচিয়ে বলল, "তিলু, চা কখন দিবি রে।"

"বাবা একটা জিনিস হয়তো তুমি বুঝতে পারছ না কিংবা হয়তো বোঝ, চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মাঝের সময়টাতেই পুরুষ মানুষ তার জীবনের একটা হিসেবনিকেশ কষে। আচ্ছা, ছোটবেলায় তোমার বাবা জীবন সম্পর্কে যা কিছু তোমায় বলেছিল, বুঝিয়ে ছিল এখন জীবনের মাঝপথে এসে সত্যিই সেই রকমটাই কি মনে হচ্ছে?"

"না।"

"ভবিষ্যতের দিকে এখন তাকিয়ে মনে হচ্ছে কি অতীতটাই ভাল ছিল?"

কি উত্তর সে দেবে ? গত ছাব্বিশটা বছর যা ছিল সামনের ছাব্বিশটা বছরও সেই একই সম্ভ্রমের মধ্যে থাকবে। একমাত্র বিশ্বজিৎ গুপ্তা জানে কি কষ্ট ও [illegible] বহন করে চলেছে।

"পুরুষ মানুষ ভুলে থাকে এই বয়সে। আমি কিন্তু তোমাকে [illegible] দেখলাম না।" ছিন্নু উঠে বসল। "একই ভাবে বছ[illegible] [illegible]রে বছর টানটান পরে গেলে একই চেয়ারে টেবিলে বসে। আমি মানছি [illegible] [illegible] কোয়ালিফিকেশন বা বিদ্যাবুদ্ধি আছে এর বেশি কিছু করা সম্ভব নয় [illegible] [illegible]ন্তু তাড়াতাড়ি জীবনটাকে উপভোগ করা মানে এই সময়টাতেই। তোমাদের [illegible] জীবনকে চুমুকে চুমুকে খাবার কথা আমি জ্ঞান হওয়া থেকে তোমাকে দেখ[illegible] [illegible] সেই খেয়ে গেলে, নিজেকে একটু বাঁকাবাঁকিও করলে না।"

ছিন্নু এত বেগে কথা বলছে কেন [illegible] সেটা বোঝা গেল না আমার ? প্রিয়ব্রত শুনতে শুনতেই ভেবে গেছে নিজের কথা। কেন আমি নিজেকে উপভোগ করতে পারিনি সেকথা ওকে বলা যাবে না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারত কিন্তু ছিন্নুকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে তোলার জন্য টাকার দরকার ছিল। বাবার দায়িত্ব যে কি জিনিস ও এখন বুঝতে পারবে না। বাবার হৃদয়ও ছুঁতে পারবে না।

মনে মনে কতবার প্রশ্ন করেছি, বয়স বাড়ছে এবার আমি কি করব ? উত্তর খুঁজতে গিয়ে বুকের মধ্যে শুধু প্রতিধ্বনি শুনেছি, এতকাল ধরে কি অর্জন করলাম ? আমি কি সুখী ? সফল ? এই জীবনই কি চেয়েছি ? প্রিয়ব্রত একদৃষ্টে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পলক যেন পড়ছে না। শরীরে কোন উত্তেজনা নেই। মধ্য জীবনের এই অনুভূতি বড় মর্মান্তিক, বড় নিঃসঙ্গ করে দেয়। কিন্তু এটাই তো সে কাজে লাগিয়ে খোলস বানিয়েছে।

"তোমার কি কখনো মৃত্যুর কথা মনে এসেছে ?" ছিন্নু সামনে ঝুঁকে তাকে চেয়ারে বসার জন্য হাত বাড়িয়ে ইসারা করল। বসবে কি বসবে না ? ছেলে তার খোলস ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। এখন ওটা ভেঙ্গেই বা কি লাভ ? ভেতর থেকে তো বেরিয়ে আসবে রুগ্ন, আড়ষ্ট, চোখ পিটপিট করা একটা লোক, গ্যাস্ট্রিকের ব্যথাকে মাঝেমাঝে হার্ট অ্যাটাক ভেবে যে ঘামতে শুরু করে।

"না মনে আসেনি।"

"ভাল, খুব ভাল। বাবা যতদিন বেঁচে থাকে ছেলে ততদিন নিশ্চিন্ত বোধ করে, মরাটরার কথা তখন আর মনে আসে না, কলকাতার রাস্তাতেও মদ খেয়ে বাইকে স্পীড তোলায় ভয় আসে না। আমার আগে তো আমার বাবার মরার

কথা, সে যখন বেঁচে রয়েছে তখন আর ভয় কি ? কিন্তু তুমি মরলেই আমি সামনের সারিতে এসে যাব সুতরাং তোমার দীর্ঘদিন বাঁচা দরকার।"

হিতু হাসছে। ওর চোখে ঝাঁঝাল ভাবটা আর নেই। প্রিয়ব্রতর মনে হল, হিতু অন্য কিছু একটা বলতে চেয়েছিল।'আর তাকে নিয়ে তুমি' বলেই, বাবা আঘাত পেতে পারে ভেবে তখন কথা ঘুরিয়ে নিয়েছে। ও তখন মুখ লক্ষ্য করছিল, নিশ্চয় দেখেছে বাবার মুখটা কিরকম যেন কালো হয়ে গেল ! কিন্তু কি জন্য ও নীরুর আসাটা পছন্দ করেনি ?

তিলু দু'কাপ চা নিয়ে ঢুকল। ওর চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে প্রিয়ব্রত বলল, "বেশি দিন বাঁচাটা শেষ পর্যন্ত কষ্টের হয়ে ওঠে। ঠাকুর্দা নব্বুই বছর বেঁচেছিলেন। ছেলে-মেয়ের মানে আমার বাবার, পিসির মৃত্যু তাকে দেখতে হয়েছে, নিজের স্ত্রীরও। নেহাত তখন জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল বলে তাই খানিকটা বেঁচে গেছিলেন। ওনার রাগ, দুঃখ, শোকতাপ, যাবতীয় ঝঞ্ঝাট সবাই ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। কিন্তু আমার তো কোন ফ্যামিলিই নেই। অফিস থেকে ফিরে চুপচাপ বসে শুধু টি ভি দেখা নয়তো কাগজ পড়া !"

"নিঃসঙ্গ বোধ করছ·····কম্প্যানিয়ন চাই ?"

প্রিয়ব্রত চায়ে চুমুক দিল। হিতুর স্বরে হালকা ফাজলামোর ছোঁয়া থাকলেও সে কিন্তু উত্তর দিল না। কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে এই কম্প্যানিয়ন শব্দটা বলার পিছনে।

"মা মারা যাবার পর তুমি তো বিয়ে করতে পারতে !"

"পারতুম। কিন্তু তা হলে তোকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করে তুলতে পারতুম না।" প্রিয়ব্রতর সন্দেহ হচ্ছে, হিতু বোধ হয় তাকে খেলাচ্ছে।

"এখন তো আর আমাকে নিয়ে তোমায় ভাবতে হচ্ছে না, নিজের কথা এবার ভাবতে পার।"

হিতু এক চুমুকে কাপ খালি করে আবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। বইটা তুলে মুখের কাছে ধরে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, "খুদি কেলোর মেয়েকে তো ছোট থেকেই দেখেছি। রোগা হলেও মন্দ দেখতে নয়, মুখ চোখ শার্প,·····ও মেয়েকে কিন্তু কেউ বিয়ে করবে না।"

"কিন্তু ওর তো কোন অপরাধ নেই, ইচ্ছে করে ও এটা ঘটায়নি।"

"সেটা বোঝাবে কাকে ? চার পাশের মানুষজনকে তো দেখছ, মনে হয় কি কেউ বিয়ে করতে রাজি হবে ?·····তোমাকে বললে কি—" হিতু হোঁচট খেয়ে থেমে গেল।

প্রিয়ব্রত মনে মনে হাসল। হিতুর উদ্দেশ্যটা সে বুঝতে পেরেছে। বাবার নিঃসঙ্গতা কাটিয়ে তোলার জন্য ওর মনে হয়েছে এটাই আসল পথ। কি তা হলে লেখাপড়া করল? কাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে?

"আমি এটা এমনিই বললাম, ...কথার কথা মাত্র।" হিতু আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে পিঠ চুলকোবার জন্য কাত হল।

তুই কি বিয়ে কবতিস? প্রিযব্রত বলতে গিয়েও বলল না। হয়তো জেদ দেখিয়ে 'হ্যাঁ' বলবে, কথাব পিঠে কথা জমবে, অথচ দু'জনেই জানে মনের সৎ ইচ্ছা প্রকাশ করার চর্চা হিসেবেই তারা নিরুকে ব্যবহার করছে।

"মেয়েটা খুন হবে যদি কোর্টে দাঁড়িয়ে তিনজনকে চিনিয়ে দেয়। আমাকে বলেছিল 'তা হলে কি করব?' আমি বললুম পালিয়ে যাও। ও বলল, 'আমাকে লুকিয়ে রাখতে পারেন?' নিরু আমাদেব নিচের ঘরে লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল মামলাটা খারিজ না হওয়া পর্যন্ত। আমি রাজি হইনি।"

হিতু বইটা নামিযে রেখেছে বুকের উপর। চোখে ঔৎসুক্যর নীচে কোমল ছায়া। খালি চায়েব কাপ হাতে নিয়ে প্রিয়ব্রত ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

নিজের ঘরে এসে কাগজগুলো ভাঁজ করে সে টেবিলে বাখল। বিছানার চাদবটা সমান করে পাতল। শুধু বুক নয় সারা শরীরটাই ভারি লাগছে যেন গায়ের চামড়া সিসে দিয়ে তৈরি। তার এখন কিছুই করার নেই।

কাছাকাছি কোন বাড়িতে মেয়েদের ঝগড়া হচ্ছে। প্রায়ই হয়। তিলু ঘর মুছে গেছে। মোছার দাগ দেখা যাচ্ছে জানলা দিযে আসা আলোয়।...নিরু যদি লুকিয়ে থেকে প্রাণ বাঁচাত তা হলেই বা কি হত? সারা জীবনই তো এই ঘটনাটা ওর সঙ্গে থাকবে! চেনা লোকেদের এড়িয়ে চললেও নিজের স্মৃতিকে তো মুছে ফেলতে পাববে না। যখন তখন বুকের মধ্যে লোডশেডিং হবে। মোমবাতি জ্বালিয়ে ওব চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার জন্য কাউকে পাবে না। অতুলচন্দ্র ঘোষকে কি মুছে ফেলা যাবে নির্বিঘ্নে রিটায়াব করার পরও?

ফণী পালের খোঁজ নিতে একবার ওর বাড়িতে যেতে হবে। এক মাস আগে শেষ দেখেছে। ওর বাড়ির গলিটা তার মনে আছে। দু'বার মাত্র গেছিল তা-ও ছাব্বিশ বছর আগে। একই ধরনের পাশাপাশি দুটো দরজা কিন্তু কোনটা যে ফণী পালের সেটা এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

তাকে নিয়ে গেছিল নন্তু। একতলায় স্যাঁতসেতে ঘরটায় ছিল তক্তপোশ। সেটা ছাড়া দ্বিতীয় কোন জিনিস ছিল না, দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডারও নয়। মোটা দেয়াল, ছোট একটাই জানলা, তার শিকগুলো ছিল খুবই সরু। সিলিং

নিচু, কাঠের কড়িবরগা। তক্তপোশে বসে ছারপোকার কামড় খেয়েছিল।

'ধরা পড়লে কি হবে? তা আমি কি করে বলব?' ফণী পাল দু'জনকে একসঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল। 'তা ছাড়া ধরা পড়বেই বা কেন যদি নিজেরা সাবধান হয়ে প্রথম কয়েকটা মাস চলো! নামটা পরে বদলে দেবার ব্যবস্থা করব, তাতো বলছিই। এ সব গ্যারান্টি তো আর লেখাপড়া করে হয় না, মুখের কথাই সব। তোমরা যদি মনে করো আমি ধাপ্পা দিয়ে টাকা নিচ্ছি তা হলে আর এসো না, ব্যাস! আর যদি বিশ্বাস করো তা হলে এসো, অবশ্য টাকাটা সঙ্গে নিয়ে।'

'পাঁচ হাজার একটু বেশি।' প্রিয়ব্রত বলেছিল।

'কিছু বেশি নয়। সারা জীবনে চাকরি থেকে কত লাখ টাকা পাবে, সেটা কি হিসেব করেছ? তোমরা কি ভেবেছ সব আমার পকেটেই যাবে? বখরাদার আছে।'

দরজার বাইরে সরু দালান দিয়ে আনাগোনা করছিল দু-তিনটি বালক। ময়লা থান পরা এক বুড়ি কোলে একটা ল্যাংটো বাচ্চা নিয়ে ঘরে এসে বলল, 'অ ফণী, একবার ডাক্তারের কাছে যা বাবা, জ্বর তো ছাড়ছে না।'

'যাব খন।'

'আজ দু'দিন হল রান্নাঘরের ডুমটা কাটা।'

'আজ কিনে দেব, এখন যাও তো এখান থেকে।'

ফণী পালের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নন্তু বলেছিল, 'কি করবি?'

'বুঝতে পারছি না।'

'আমার কিন্তু লোকটাকে সুবিধের মনে হচ্ছে না। অতগুলো টাকা, যদি মেরে দেয়!'

নন্তু আর যায়নি কিন্তু সে গেছিল। নন্তু পরে ছোট একটা হোসিয়ারি দোকান খোলে হাতিবাগানে, এখন শুধু চা পাতা বিক্রি করে। দোকানের সামনে খদ্দেরের ভিড় দেখেছে, ভালই চলে। চাকরিতে ঢোকার মাস ছয়েক পর ওর সঙ্গে প্রিয়ব্রতর দেখা হতে নন্তু জিজ্ঞাসা করেছিল, ফণী পালের কাছে আর সে গেছিল কি না? ওকে সে মিথ্যা কথা বলেছিল। না বললে, নন্তুও একটা গলার কাঁটা হয়ে থাকত।

ঝিমুনি আসছে। কোন দিনই এমন সময়ে তার ঘুম পায় না। অফিস কামাইটা তার জীবনযাপন রুটিনের বাইরে প্রথম বেনিয়ম।

হিতু দরজায় এসে উঁকি দিয়ে প্রিয়ব্রতকে কপালের উপর দু'হাত আড়াআড়ি রেখে শুয়ে থাকতে দেখে ফিরে যাচ্ছিল। সে ডাকল।

"কিছু বলবি ?"

"হ্যাঁ। মেয়েটা যদি নীচের ঘরে থাকতে চায় তা হলে থাকুক না, আমার কোন আপত্তি নেই।"

ছেলের মুখের দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। ওর মুখে গুরু গম্ভীর কোন সদিচ্ছা নেই শুধু ছেলেমানুষী একটা লাবণ্য ছাড়া।

"না। তা হয় না।"

"ওকে যদি বেঁচে থাকায় সাহায্য করা যায়—"।

কাকে সাহায্য করার কথা হিতু বলছে ? নিরুকে না বাবাকে ? নিঃসঙ্গতা ঘোচাবার জন্য কি সহজ সরল সমাধানই ও ছকে ফেলেছে !

"ওকে কোনভাবেই সাহায্য করা যাবে না। এভাবে কিছু দিন লুকিয়ে থেকে মৃত্যুকে কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখা যায় মাত্র। মরা তো অনেক রকমের হয় ! ও যদি সরে যায়, মানে সত্যিই যদি খুন হয়, তা হলে সেটাই বোধ হয় ভাল হবে, তুইও কাগজে লেখার মত একটা সাবজেক্ট পাবি।"

হিতুর মুখটা মুহূর্তের জন্য অপ্রতিভ দেখাল। শেষের কথাটা জুড়ে না দিলেই বোধ হয় ভাল হত ! কিন্তু কিভাবে যেন তার মুখে এগিয়ে এল বিদ্রূপটা ! প্রিয়ব্রতর নিজেকে ছেলের কাছে ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে।

"খুন হলে তার সামাজিক দিকটাকে উপেক্ষা করা উচিত হবে না। এইভাবে অত্যাচারিত মেয়েদের যদি সমাজ—"

হিতু চলে গেছে।

দুটো হাত কপালের উপর রেখে প্রিয়ব্রত চোখ বন্ধ করল।

সন্ধ্যার মুখে সে ফনী পালের খবর নিতে বাড়ি থেকে বেরোল। বেনেটোলার রাস্তাটা দিয়ে তেলেভাজা-মুড়ির দোকান পর্যন্ত গিয়ে সে ডান দিকের সরু রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবিকল গোপী বসাক লেন কিংবা কালীমোহন মিত্র স্ট্রীটের মতই রাস্তাটা। সেই আঁস্তাকুড়, টিউবওয়েল, ঢিবি, গর্ত, ইট-বার-করা দেয়াল, উনুনের ধোঁয়া। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হয়ে নেওয়াই ভাল। ফনী পালের মত লোককে এখানে সবাই নিশ্চয় জানে। চুল কাটার দোকানে দাড়ি কামাচ্ছে একজন। প্রিয়ব্রত এগিয়ে গেল।

"আচ্ছা ভাই, এখানে ফনী পালের বাড়ি কোথায় বলতে পারেন ?"

বাঁ হাতে মাথাটা ধরা, ডান হাতে ক্ষুর গালের উপর দিয়ে টানতে টানতেই নাপিত বলল, "কি করে ?"

"তা ঠিক বলতে পারব না। মনে হয় কিছু করতেন না। বয়স হয়েছে, প্রায়

সত্তরের কাছাকাছি।"

"আপনার কেউ হন ?" ক্ষুর থেকে সাবানের ফেনা বাঁ হাতের কব্জিতে ঘষে লাগিয়ে লোকটি তাকাল।

"না, পরিচিত লোক, মাঝে মাঝে দেখা হত।"

"শেষ কবে দেখা হয়েছে ?"

প্রিয়ব্রতর বুকের ভিতরটা সামান্য কেঁপে উঠল। একথা কেন বলল ? তা হলে কি..... "একমাস আগে শেষ দেখেছি। উনি আসবেন বলে আর আসেননি।"

"কোনদিন আর আসবেনও না। মারা গেছেন।"

"য়্যাঁ, সে কি !" প্রিয়ব্রত বুকের মধ্যে প্রচণ্ড মোচড় পেল। হাত বাড়িয়ে সে দোকানের পাল্লাটা ধরে নিজেকে দাঁড় করিয়ে রেখে শুধু তাকিয়ে রইল লোকটির মুখের দিকে।

আমি কি মুক্তি পেলাম ! লোকটা যা বলল, সেটা কি সত্যি ? আমি কি বিশ্বাস করব ওর কথা ? ছাব্বিশ বছর ধরে বয়ে বেড়ান অতুল কি কাঁধ থেকে এবার নামবে ?

"কুড়ি বাইশ দিন আগে, ক্যান্সারে মারা গেছেন। এই গলির মধ্যে ডান দিকে, প্রথম, দ্বিতীয়, থার্ড বাড়িটা। মাস চারেক আগে ধরা পড়েছিল, তারপর এই সেদিন আর জি করে ভর্তি হয়ে চার দিনের দিনই মারা গেলেন। পেটে হয়েছিল, স্টম্যাক ক্যান্সাব। শ্রাদ্ধ ট্রাদ্ধও তো হয়ে গেছে।"

লোকটা ব্রাশ দিয়ে আবার গালে ফেনা লাগাতে শুরু করল। এতবড় একটা খবর দিল অথচ কি নির্বিকার মুখ ! ওর কি বিকার ঘটার কোন কারণ আছে যেমন তার রয়েছে !

চার মাস ধরে ক্যান্সার অথচ ফণী পাল একই রকম মুখ, একই হাঁটা, গলার স্বর, একই চাহনি নিয়ে তার সামনের টেবিলে এসে বসেছে। একবারের জন্যও তাকে টের পেতে দেয়নি ! যে পকেটে নোট ভরা খামটা ঢোকাত সেই পকেটেই চার মাস ধরে ছিল যমের পরোয়ানা !

আমি মুক্ত ! ভগবান কি কাল তা হলে প্রার্থনা শুনেছিলেন ? কিন্তু ক্যান্সার তো চার মাস আগেই ওর পেটে ঢুকে গেছিল ! কুড়ি বাইশ দিন আগেই সে মুক্তি পেয়ে গেছে, অথচ সে জানত না ! লাক্, ভাগ্য। খোঁজ নিতে না এলে তো আরো কতদিন সে—

"ডানদিকে, থার্ড বাড়িটা ?"

"হ্যাঁ।"

দু-চার পা এগিয়েই সে শুনতে পেল নাপিত বলছে, "মরে গিয়ে ভালই হয়েছে, এসব রোগে তো……নিজেও কষ্ট পাবে অন্যকেও কষ্ট দেবে।"

ছাব্বিশ বছর কষ্ট দিয়েছে একজনকে, তার সুখ শান্তি হরণ করেছে……দগ্ধে দগ্ধে তার জীবন খাক্ করে দিয়েছে। ফণী পাল তুমি যে কি উপকার করলে! নিজে মরে আমাকে বাঁচিয়ে তুললে। একটা নতুন জীবন এবার চাই, যা কিছু হারিয়েছি……প্রিয়ব্রতর ইচ্ছে করছে চীৎকার করে বলতে, সব আমি ফিরে পেতে চাই।

তৃতীয় বাড়ির আধখোলা সদর দরজা দিয়ে সরু দালানটার শেষ প্রান্তে বাচ্চা কোলে এক স্ত্রীলোককে সে দেখতে পেল। পা দিয়ে জল সরিয়ে উঠোনে ফেলছে। বাঁ দিকের যে ঘরে সে আর নন্তু বসেছিল সেটার দরজা খোলা। ঘরের যেটুকু অংশ চোখে পড়ল তাইতে সে বুঝল কোন পরিবার সেখানে বাস করছে। সে খুট খুট করে কড়া নাড়ল।

"কে?" বাঁ দিকের ঘর থেকে বেরিয়ে এল শালোয়ার-কামিজ পরা এক কিশোরী। "কাকে চাই?"

"আচ্ছা এটাই তো ফণী পালের বাড়ি?"

"হ্যাঁ, উনি তো মারা গেছেন!"

"কবে? কি হয়েছিল ওনার?" তা হলে সত্যিই! প্রিয়ব্রত উত্তেজনা দমিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

"ক্যান্সার হয়েছিল। তা তিন হপ্তার মত হল মারা গেছেন।"

"ফণী পাল, যাঁর হাতের আঙুলে তিনটে আংটি, হাতে লাঠি নিয়ে চলাফেরা করত, বয়স হল গিয়ে পঁয়ষট্টির মত……সেই লোকই তো?" নিশ্চিত হয়ে নেওয়া দরকার। প্রিয়ব্রত জেনে নিতে চায় এই নামে দ্বিতীয় কোন লোক এই বাড়িতে মরেনি।

"হ্যাঁ!" মেয়েটির বিস্মিত হওয়া দেখে প্রিয়ব্রত কিছুই মনে করল না। এভাবে কেউ জিজ্ঞাসা করলে তো হওয়ারই কথা।

"কে কে আছেন ওঁর?"

"বৌ, দুই ছেলে, ছেলের বৌয়েরা, নাতি নাতনিরা……আপনি দোতলায় যান, এই ঢুকেই বাঁ দিকে সিঁড়ি, ওনারা ওপরে থাকে।"

"না না, এই যথেষ্ট।"

প্রিয়ব্রত ফিরে আসার সময় একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। মেয়েটি বাড়ির

ভিতর থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে তাকে দেখছে। দেখবেই তো! একটা লোক কথা বলতে বলতে হঠাৎ চলে গেলে, সে তো কৌতূহলের পাত্র হবেই। তাই হব। সবাইকে অবাক করে দেব। অতুল ঘোষ শুধু অফিসের হাজিরা খাতায়, মাইনের পে-স্লিপে, ভৌমিকের 'অতুলদা' ডাকের মধ্যে যেমন ছিল তাই থাকবে বাড়ি পর্যন্ত ওকে আর আসতে হবে না।

পাড়ায়, বাড়িতে, বাজারে, পথে, বাসে ক'জন তার নাম ধরে ডাকে? সে মনে করতে পারল না শেষ কবে সে 'প্রিয়' ডাক শুনেছে। কারুর সঙ্গেই তার এখন ডেকে কথা বলার মত সম্পর্ক নেই। পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে দেখাই হয় না, হলেও ঠোঁটটা টেনে তারা পাশ কাটিয়ে চলে যায়। শুধু খুদিকেলোর সঙ্গে কালই প্রথম কথা বলল আর বাজারে বীরুদার সঙ্গে। আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে কালেভদ্রে দেখা হয়। তাদের মধ্যেও তার নাম ধরে ডাকার বয়সীদের সংখ্যা কমে আসছে। প্রিয়ব্রত নিরাপদ, অতুলেরও ভয় পাবার একমাত্র কারণটাকে ক্যান্সার শেষ করে দিয়ে গেছে।

'একটা চিঠি দিয়ে যদি তোমার ডিরেক্টরকে সব জানিয়ে দিই তা হলে কি হবে জান?'

তখন সে জানত কি হবে। এখন সে জানে ওই চিঠি কোনদিনই তার অফিসে পৌঁছবে না। মাসে মাসে পাঁচশো টাকার খামটা আর তাকে টেবিলের ওধারে ঠেলে দিতে হবে না। গভীর গাঢ় ঘুমের জন্য আর সে ছাদে পায়চারি করবে না।

'জ্ঞান হওয়া থেকে তোমায় দেখলাম শুধু গঙ্গাজলই খেয়ে গেলে!'

হিতু ঝাঁকাঝাকি দেখতে চায়! জীবনকে নাকি মদের মত খেতে হবে! এই ফণী পালই তাকে কুরে কুরে খেয়ে ফোঁপরা করে দিয়ে গেছে।…হিতু তাচ্ছিল্যভরে কথাগুলো বলেনি। বলার সময় রাগে থমথম করছিল ওর মুখটা। একটা লোক তার জীবনের তুঙ্গে থাকার বয়সে যে ভাবে কথা বলে, চলে, ফেরে, হিতু সেইভাবে তার বাবাকে দেখতে পায়নি। না দেখতে পাওয়ার জন্য দায়ী তো ফণী পাল!

কিন্তু আর সময় আছে কি জীবনকে তুঙ্গে টেনে তোলার? সারা জীবনই সমতল ভূমিতে সে হেঁটেছে! একবারও তার মনে হয়নি এই একই মাপে কদম ফেলে ফেলে যাওয়ার পিছনে কোন কারণ বা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যহীন, অকারণ জীবন যাপন! আমার যা বিদ্যেবুদ্ধি তাতে চড়াই ভাঙ্গার চিন্তা সত্যিই অসম্ভব। বাস থেকে নেমে অফিস যাওয়ার সময়ে অতুল ঘোষ হয়ে যাওয়া আর অফিস থেকে বেরিয়ে প্রিয়ব্রত নাগ হওয়া—ছাব্বিশ বছর ধরে এই ভাবে চলে

আসছে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা ভয়ের জগতে ঢুকে যাওয়া আর নির্বিঘ্নে ফিবে এসে-পবেব দিনটার জন্য নিজেকে তৈরী করা '... হিতু বলল, 'আমি কিন্তু তোমায় তা দেখলাম না।' কি দেখতে চেয়েছিল ? মদ খেয়ে বাইক চালিয়ে মাঝরাতে বাড়ি ফেরা ? সেটাই তুঙ্গ ?

প্রিয়ব্রত বাড়ি ফিবল দু' ঘণ্টা পর। ততক্ষণ সে হেঁটেছে। এ রাস্তা ও রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে সে থমকে দাঁড়িয়েছে, নিজের সঙ্গে কথা বলেছে। শূন্য চোখে তাকিয়ে আলো, দোকান, যানবাহন, লোকজনের ভাবভঙ্গি, কথাবার্তা শুনেছে, দেখেছে আর ভেবেছে, ফণী পালের অস্তিত্ব মুছে যাওয়ার জন্যই কি এই পৃথিবীটা ঝকঝকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছে ? এটাই কি তাব জীবনের সেরা মুহূর্ত ? প্রিয়ব্রত তখন আনমনে ঘড়ি দেখেছিল।

কলিংবেল বাজিয়ে সে অপেক্ষা করে। ছাদ থেকে তিলুর গলায় "কে এ এ", শুনে সে, "আমি" বলাব পরই ভেবেছিল, আর একটু জোরে, আরো ভরাট স্বরে 'আমি' বললেই ঠিক হত। এখন সে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কথা বলতে পারার মত অবস্থায় এসেছে। অতুলচন্দ্র ঘোষকে ধবিয়ে দেবার জন্য আব কেউ জীবিত নেই।

দরজা বন্ধ করবার জন্য পাল্লাটা ধরে তিলু দাঁড়িয়ে ছিল। প্রিয়ব্রত তার পাশ দিয়ে ভিতরে যাবাব সময বলল, "কেউ এসেছিল ?"

কারুরই আসার সম্ভাবনা নেই, তবু সে বলল। বাবা রোজ এইভাবে বলতেন অফিস থেকে ফিরেই। আজ সে বাবাকে অনুকরণ করল।

"না, কে আবার আসবে।"

"কেন আসতে পাবে না ? আমার কি বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন নেই ?"

তিলুর মুখ ভঙ্গি দেখে ওকে তার চড কষাতে ইচ্ছে করল। হিতু লাই দিয়ে মাথায় চড়িয়েছে। তালাবন্ধ ঘব দুটোব পাশ দিয়ে যাবার সময় সে থমকে দাঁড়াল।

"অ্যাই, এদিকে আয়। ...বলেছিলুম তালা দুটোয় মাঝে মাঝে কেরোসিন তেল দিবি, দিয়েছিলি ?"

"এই তো ক'দিন আগে ঘর খুলে—"

"চোপ, মিথ্যে কথা বলবি না।" প্রিয়ব্রত হাঁফ ছাড়ল চেঁচিয়ে ওঠার সুযোগটা পেয়ে। কিরকম মরচে ধরেছে দেখেছিস ? কালকেই তেল ন্যাকড়া দিয়ে ঘষে ঘষে তুলবি।...শুধু খাওয়া আর ঘুম আব টিভি !"

সিঁড়িব আলোটা নেবানো। একতলারটা জ্বালা থাকলে ওটার জ্বালার আর

দরকার হয় না। তবে একফালি আলো এখন সিঁড়ির মাথায় দেখে সে বুঝল অশোকবাবুদের দরজা খোলা। পা টিপে সে উঠতে লাগল।

বৌটি কোমর থেকে শরীরটা নুইয়ে ন্যাতা দিয়ে মেঝে মুছছে। বুকের কাপড় ঢিলে হয়ে কাঁধ থেকে ঝুলে রয়েছে. ব্লাউজ পরা নেই। প্রিয়ব্রত পরিষ্কারভাবেই অনাবৃত পাঁজর, বগলের চুল আর স্তন দেখতে পেল। বড়জোর সেকেন্ড চার-পাঁচ। চোখ সরিয়ে নেবার আগেই বৌটি চমকে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকাল। চোখের উপর দিয়ে ওর বিস্মিত চাহনিটা ঘষে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিয়ব্রত তিনতলার সিঁড়ির দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে পা বাড়াল। সিঁড়িটা অন্ধকার হয়ে গেল তখুনি। দরজাটা তো বন্ধ করেই রাখা উচিত ছিল।

কি ভাবল বৌটি! ...কিন্তু আমার কোন দোষ আছে কি? সিঁড়ি দিয়ে লোক ওঠানামা করবেই, তা হলে দরজা খুলে আদুড় গায়ে অমন করে ঝুঁকে পড়া কেন? আমি এ ব্যাপারে পরিষ্কার।

ঘরে এসে জামার বোতাম খুলতে খুলতে সে মঙ্গলার ছবির দিকে তাকাল। কতদিন হল...বারো বছর, কোন মেয়েমানুষের বুক দেখিনি। মঙ্গলাই প্রথম আর শেষ। এই খাটেই তারা তিনজন শুত, মাঝখানে হিতু। তারা অপেক্ষা করত হিতুর ঘুম গাঢ় হবার জন্য। অন্ধকারে সন্তর্পণে তারা কাজটা সেরে ফেলত। মঙ্গলা নগ্ন হয়নি কখনো, এটা চিন্তাই করতে পারত না। এখন সে প্রায় ভুলেই গেছে নারী দেহের বিভিন্ন জায়গা স্পর্শ করার অনুভবটা কেমন। চুমুর স্বাদ, শরীরের গন্ধ সম্পর্কে কিছুই আর তার স্মৃতিতে ধরা নেই।

মঙ্গলা একটু বেশি নাদুস নাদুস ছিল, দোতলার বৌ তা নয়। গ্রামের মেয়ে, খাটিয়ে শরীর। খুব কমই ওকে ঘর থেকে বেরুতে দেখেছে। অবশ্য সিঁড়ি দিয়ে তার ওঠানামা তো বাজার আর অফিস যাওয়ার সময়, এর মধ্যে কতটুকুই বা দেখার সুযোগ পাওয়া যায়!

জামাটা চেয়ারের পিঠে ছুঁড়ে দিয়ে প্রিয়ব্রত খাটে বসল। ফণী পাল একদিনই শুধু এই ঘরে এসেছিল। ওই চেয়ারে বসে কথা বলেছিল। মঙ্গলা তখন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল পাথরের মত। ওর মুখটায় কি যেন একটা ব্যাপার ছিল......সেটা এত বছর পর সে কাল নিরুর মুখে দেখতে পেয়েছে।

"তিলু খিদে পেয়েছে রে, রান্না হয়েছে?"

"হয়েছে...দিচ্ছি।"

মঙ্গলার সঙ্গে এই মেয়েটার সাদৃশ্য মুখের একটা অভিব্যক্তিতে ছাড়া আর কিছুর মধ্যে সে খুঁজে পাচ্ছে না। অসহায়, করুণ ঝাপসা অন্ধকার ভেদ করে

জীবনের দিকে তাকাবার চেষ্টায় হাঁচড়পাচড়ের মত ভাব। যেন গলা টিপে ধরায় চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। তারপরই একটা টিনের মুখোস এঁটে বসল। যন্ত্রণার চাপে মুখোসটা দুমড়ে যাচ্ছে। কতক্ষণের জন্য ওরা দুজন একই মুখ পেয়েছিল, দশ সেকেন্ড? ...দশ মিনিট?

তারপরও মঙ্গলা জীবনের নিয়মকানুন, অভ্যাসগুলো পালন করে গেছে। রান্নায় নুন বেশি হয়েছে শুনে অপ্রতিভ মুখে তাকিয়েছে, ...বাজার থেকে ফেরার পর 'পায়ের কাদা ধুয়ে ঘরে ঢুকবে' বলেছে, ...মা মারা যাওয়ার খবর পেয়েই ফুঁপিয়ে উঠেছে, ...উঠোন নোংরা রাখার জন্য ভাড়াটের সঙ্গে ঝগড়া করেছে... ঘুমন্ত ছেলের মাথার উপর দিয়ে একটা হাত এগিয়ে এলে সেটা আঁকড়ে বুকের উপর চেপে ধরেছে। প্রিয়ব্রতর এখন ছাড়াছাড়া মনে পড়ল, অথচ এই ভাবে দিন কাটানোর মধ্যে একবারও ফণী পালের নাম তারা উচ্চারণ করেনি। কিন্তু পয়লা তারিখে তিনশো টাকা কম হাতে পাওয়ার মুহূর্তে মঙ্গলার মনে ঢাকনা সরে গিয়ে একটা অন্ধকার গর্ত বেরিয়ে পড়ত না কি? নিশ্চয় পড়ত, স্বভাবটা ওর চাপা ছিল।

এখন মঙ্গলা আর ফণী পাল দুজনেই মৃত। হাল্কা বোধ করেও প্রিয়ব্রত বিষণ্ণতার স্পর্শ পেল। তার হাঁফছাড়ার অংশীদার হতে পারত মাত্র একজনই... দুজন একসঙ্গেই হয়তো বলে উঠত, "ভগবান আছেন।"

"কিছু বললেন?" একতলা থেকে জল আনতে সিঁড়ির বালতি হাতে তিলু দাঁড়িয়ে পড়েছে।

"আলুর দমটা খুব ভাল হয়েছে, শিখলি কোথায়?"

তিলুর মাড়ি বার করা হাসি দেখবে না বলেই প্রিয়ব্রত তাকাল না।

"তাও তো গরমমশলা কম পড়েছে। দোতলার বৌদির কাছে চাইতে গেলুম, বলল নেই। ছিল ঠিকই আসলে দেবার ইচ্ছে ছিল না।"

"তুই জানলি কি করে?"

"আমি লোক চিনি।"

"আমাকে চিনিস? বলতো আমি কেমন?"

"পরে বলব।" তিলু সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে গিয়ে আবার উঠে এসে গলা নামিয়ে বলল,

"সন্ধ্যেবেলায় পেছনের বাড়িতে খুব ঝগড়া হচ্ছিল।"

"কোন পেছনের বাড়ি?"

"কাল যে মেয়েটা এসেছিল, ওর গলা আর ওর মায়ের গলা পেলুম। ঠিক

বুঝতে পারলুম না কি নিয়ে ঝগড়া। একবার শুনলুম 'মরি মরব তোমাদের কি ?' মা'টা বলল, 'দূর হ দূর হ, আমার আরো চারটে মেয়ে আছে।' আমি পাঁচিলে দাঁড়িয়েছিলুম। তারপর দেখি অন্ধকার ছাদে এসে একজন সিঁড়ির দরজার দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসল, বোধহয় মেয়েটাই।"

তিলু নীচে নেমে গেল। ও কেন গলা নামিয়ে বলার দরকার বোধ করল ? প্রিয়ব্রতর মুখের মধ্যে আলুর টুকরো হঠাৎ বিস্বাদ হয়ে উঠল। তিলু নাকি লোক চেনে ! তাকে তা হলে কি ভাবে চিনেছে ? নিরুর সামনে তার গলার স্বরে, চাউনিতে বা বসার ভঙ্গির মধ্যে এমন কিছু কি প্রকাশ হয়েছিল যাতে তিলুর মনে হতে পারে····।

কি মনে হতে পারে ?

প্রিয়ব্রতর কপালে হাল্কা ঘাম ফুটে উঠল। কাল সে স্বাভাবিকভাবেই তো তাকিয়ে ছিল নিরুর দিকে ! রেপ, খুনের ভয়, প্রাণের মায়া, এইসব নিয়ে কথা বলার সময় গলার স্বরে অস্বাভাবিক কিছু ছল্‌কে ওঠা কি সম্ভব ? তবে একতলায় সে ওর কাঁধে হাত রেখেছিল কিন্তু তিলু তখন ওখানে ছিল না। হ্যাঁ, সে রেখেছিল। নিরু হাতটা তখন চেপে ধরে বলেছিল, 'এই ঘরেই আমি থাকব, থাকতে ঠিক পারব।'

তারপর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে খিল খুলেছিল। তার আগে সে বলেছিল, 'হয় না হয় না, তুমি এখনো ছেলেমানুষ—।' সে ফুঁ দিয়ে মোমবাতি নেবাল। নেবাবার আগে নিরুর মুখেব দিকে তাকিয়ে ছিল। নিরুও তাকিয়ে কিন্তু ওর চাহনিতে কোন কথা বলা ছিল না।

খাবার শেষ না করেই প্রিয়ব্রত উঠে পড়ল। তিলু জল নিয়ে এসেছে।

"বিকেল থেকে অম্বল হচ্ছে, আব খাব না।"

ঘরের আলো না জ্বেলে সে জানলায় দাঁড়াল। এখনো কি নিরু দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে ? অন্ধকার ছাদে সে খুঁজল। দু-তিন হাত লম্বা একটা ঘন গাঢ় অন্ধকার ছাদের মাঝখানে যেন সে দেখতে পেল। নিরু কি শুয়ে রয়েছে ?

গরাদে মুখ লাগিয়ে প্রিয়ব্রত তাব দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতার শেষ সীমায় নিয়ে গেল। ওটা কি কোন মানুষ ? নাকি একটা কাপড় পড়ে রয়েছে ? ঘরের আলো জ্বাললে তার আভায় ছাদের অন্ধকার কিছুটা ফিকে হবে। জ্বালব ?

কিন্তু সত্যিই যদি নিরু হয় ? ঘরের আলোর দিকে নিশ্চয় তাকাবে। চোখ দুটো কি দেখতে পাওয়া যাবে ? একটা কিছু ওর চাহনিতে নিশ্চয় থাকবে। আর সেটা তার জানা দরকার।

"নিরু, নিরু।" অস্ফুটে সে ডাকল। গলার স্বর গবাদ ছাড়িয়ে, পগাড়ের মাঝখান পর্যন্ত পৌঁছল না।

"নিরু, নিরু।" আবার সে ডাকল, আরো মৃদু স্বরে, প্রায় মনে মনে।

'মরি মরব, তোমাদের কি ?' কেন ? কেন, একথা বললে ? বাঁচার উপায় তো রয়েছে। পালাও, কোর্টে যেও না, তুমি হাজির না হলে ওদের সনাক্ত করবে কে ? মামলা খারিজ হয়ে যাবে, তুমিও বেঁচে যাবে। ওরা কথা দিয়েছে যখন, বদমাস হলেও নিশ্চয় কথা রাখবে। দু হাজার টাকা দিক বা না দিক, আগে তুমি নিজেকে বাঁচাও।

নিরু, তোমার শরীর কিছুক্ষণ যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া কিছুই তো হারায়নি। আমাকে দেখ। আমার মন, আমার আত্মা, ছাব্বিশ বছর ধরে নরক বাস করেছে, আর তুমি মাত্র আটমাস। তোমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গ অটুট রয়েছে, তুমি সক্ষম, তোমার মধ্যে বাঁচার ইচ্ছেও ভীষণ, আমি ছাব্বিশ বছর ভয়ের চাপ সহ্য করেছি। এখন আমার সামনে আর একটা জগৎ অপেক্ষা করছে, তোমার সামনেও তাই। আমার ফণী পাল সরে গেছে, তোমার বুকে যে পাষাণ সেটা নামিয়ে ফেল।

নিরু, কাল তুমি কোর্টে যেও না। শুধু তুমিই নও, তোমার বাবা, মা, তোমার চারটে ছোট বোনও বিপদে পড়বে। তাদের কথাটাও ভাব। পুলিস যতই তোমাকে সাহস যোগাক শেষ পর্যন্ত ওরা কিন্তু তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।.....আমিও কি পারি ?

কলিং বেল বাজল।

"যাই-ই-ই।"

তিলুর পায়ের শব্দ নীচে নামছে। প্রিয়ব্রত ঘরের আলো জ্বালল। টেবিলে ঝুঁকে ঘড়িতে সময় দেখল। এগারোটা বাজতে কুড়ি। হিতু আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে, বোধ হয় কাল বেশি রাত করে ফেরাটা পুষিয়ে দিতে।

তিনতলায় থামল পায়ের শব্দটা। প্রিয়ব্রত তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। তার মনে হচ্ছে হিতু দরজা দিয়ে একবার উঁকি দেবে। চোখাচোখি হলে মুখ সরিয়ে নিতে পারবে না। তখন সে কথাটা বলবে।

"চেষ্টা করলুম তাড়াতাড়ি ফেরার, তোমার খাওয়ার আগেই যাতে পৌঁছতে পারি, পারলুম না।"

হিতুর হাতে ঝুলছে দড়ি বাঁধা তিনটে কাগজের বাক্স। টেবিলের উপর রেখে সে চেঁচিয়ে বলল, "তিলু একটা প্লেট নিয়ে আয়.....চাইনিজ। এখনো বোধ হয়

গরম আছে। না হলে গরম করে নিতে হবে।"

প্রিয়ব্রত অবাক। দড়ি খুলে হিতু প্রথম বাক্সের ঢাকা তুলে বলল, "ফ্রায়েড চিলি চিকেন। খেয়ে দ্যাখো।"

"হঠাৎ !"

"বাজার-টাজার হয়নি, মাছও নেই, নিরিমিষ খেতে কি ভাল লাগে ? আসার সময় তাই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়লুম আর তোমার জন্যও কিনে নিলুম·····লাস্ট কবে চাইনিজ খেয়েছ ?"

"কোনদিনই খাইনি।"

তিলু প্লেট এনে দিয়েছে। হিতু দুটো টুকরো প্লেটে রেখে, চোখ সরু করে প্রিয়ব্রতর দিকে তাকাল। "কোনদিনই খাওনি ? এতে তো গোমাংস-টাংস নেই !"

প্রিয়ব্রত অপ্রতিভতা কাটাতে বলল, "সে জন্য নয়, আসলে ডাল ভাত ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। চপ কাটলেটও খাই না।"

দ্বিতীয় বাক্সটা খুলে হিতু বলল, "আমেরিকান চপ সুয়ে। আর এটায় আছে প্রন ফ্রায়েড রাইস। যদি এখন না খাও তা হলে ফ্রিজে তুলে রাখুক, কাল সকালে গরম করে খাওয়া যাবে।·····অ্যাই তোর খাওয়া হয়েছে ?"

তিলু মাথা নাড়ল।

"থালা নিয়ে আয়। কাল সকালে কিন্তু পাবি না।"

তিলু থালা আনতে বেরিয়ে যেতেই প্রিয়ব্রত বলল, "একটা কথা ছিল। তিলুর সামনে বলব না।"

"কি কথা ? দাঁড়াও, এগুলো আগে ফ্রিজে তুলে দিয়ে আসি।"

প্রিয়ব্রত অপেক্ষা করল। হিতু আজ মাইনে পেয়েছে। দু বছর আগে প্রথম মাইনে পেয়ে রাবড়ির বড় একটা ভাঁড় হাতে নিয়ে এই ঘরে ঢুকেছিল। 'হাফ কেজি, সব তোমায় খেতে হবে।' প্রিয়ব্রত আশা করেছিল মাইনের পুরো টাকা হিতু তার হাতে তুলে দেবে। অন্তত প্রথমবার তাই করুক। সে নিজেই তখন বলবে, 'আমাকে দিচ্ছিস কেন, নিজের কাছেই রাখ ! যদ্দিন আমি চাকরি করছি তোকে সংসারের জন্য কিছু দিতে হবে না।' কিন্তু হিতু টাকা দেয়নি। বলেছিল, 'তোমার জন্য আগে একটা পোর্টেবল ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট টি ভি কিনব, চারটে ইনস্টলমেন্টে শোধ দেব। তারপর ইনস্টলমেন্টে একটা ফ্রিজ।' সে গভীর সুখ পেয়েছিল 'তোমার জন্য' কথাটিতে।

ছেলে তার কথা ভাবে, তার জন্য অনুভব করে এটা তাকে বিচলিত

করেছিল। ভৌমিক বলেছিল, 'অতুলদা আপনি ভাগ্যবান। ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়া তো আমার শালাব ছেলেও। বাপের গলব্লাডাব অপারেশন করাল বাঙ্গুরে পেযিং বেডে রেখে। কেন,একটা ভাল নার্সিং হোমে রেখে তো করাতে পারত! এস বি গ্রুপে অফিসার,মাইনে পাচ্ছে সাড়ে চার হাজাব আর আপনার ছেলে তো দেড় হাজার। হার্ট, বুঝলেন অন্তঃকরণ, এটাই আসল জিনিস। অথচ বাপ কি কষ্ট করেই না ছেলেকে লেখাপড়া শিখিযে মানুষ করেছে।'

হিতুর অন্তঃকরণ সত্যিই ভাল। বাবাব দুঃখকষ্ট ও বুঝতে চায়, নইলে বলবে কেন···কিন্তু সবটা কি বোঝে? জীবনের হিসেবনিকেশ করতে বলছে। ওর ধারণা এখন নাকি তার কম্প্যানিয়ান চাই। কম্প্যানিয়ান তো তার ছিলই—ফণী পাল!

"বলো।" হিতু ঘরে ঢুকেছে।

"পরিচিত একটা লোকের বাড়িতে আজ গিয়েছিলাম। বহুদিনের চেনা। বলতে গেলে ওর চেষ্টাতেই চাকরিটা পেয়েছি। অভাবী লোক মাসে মাসে কিছু সাহায্য দিতুম, অল্প টাকাই।"

হিতুব চোখে কোমল দরদ। বাবার সম্পর্কে ওর ধারণাটাই ফুটে উঠেছে। প্রিয়ব্রতর মনে হল, ছেলেব কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়ার জন্য একটু মিথ্যা বললে দু'জনেব কারুরই ক্ষতি হবে না। ব্যাপারটার বেশির ভাগই তো সত্যি। ফণী পালের চেষ্টাতেই তো এই চাকরি, মাসে মাসে টাকা দেওয়াও সত্যি। লোকটার অভাব ছিল বলেই ব্ল্যাক মেইল করত।

"গিয়ে শুনলাম ক্যানসারে দিন কুড়ি আগে মারা গেছে।"

"ওহ্‌হ!"

হিতুর মত তার চোখেও এখন বিষাদ ছড়ালো। যে কোন লোকের মৃত্যুই দুঃখের। কিন্তু ফণী পালের কথা বলার জন্য তো সে হিতুকে ডাকেনি।

"লোকটার কে কে আছে?"

"বৌ, দুই ছেলে, নাতি-নাতনি।"

"তোমার মন খারাপ লাগছে?"

"হ্যাঁ।"

"শুয়ে পড়ো।"

"হিতু, ওই মেয়েটার কি হবে?"

প্রশ্ন এবং বিস্ময় নিয়ে হিতুর চোখ-মুখ কুঁচকে গেল। "কোন মেয়েটা?"

"খুদি কেলোর মেয়ে। কাল কোর্টে ওর কেসটা উঠবে। ও যাবে কি যাবে না

সেটা এখনো ঠিক হয়নি। যদি যায়, যদি কোর্ট ওকে আসামীদের সনাক্ত করতে বলে তা হলে কি সনাক্ত করবে ? করলে, আমার ধারণা ওরা প্রতিশোধ নেবেই।"

"ওকে খুন করবে ?"

প্রিয়ব্রত মাথা সামনে ঝাঁকিয়ে বলল, "খুদি কেলোকেও পথে বসাবে দোকানটার সর্বনাশ করে, তার মানে পাঁচ-ছ'টা লোক ভিখিরি হয়ে যাবে।"

"তা হলে সনাক্ত করার দরকার কি, এতগুলো লাইফ যখন ইনভলভড ? তা ছাড়া রেপিং তো আর পৃথিবীতে এই প্রথম ঘটল না ! রেপড হয়েছে তো হয়েছে, তাতে কি এমন এসে গেল ? মেয়েরা স্বামীর হাতেও তো রেপড হয়। এখানে নয় একজনের বদলে তিনজন, এই তো তফাৎ। প্রেগন্যান্ট হয়েছে কি ? আট মাস কেটে গেছে···কিছুই হয়নি।"

"হিন্তু এটা একটা সম্মান হারানোর ব্যাপার। একটা অল্পবয়সী মেয়ের ইজ্জত পবিত্রতা কেউ জোর করে কাউকে নরকে ধরিয়ে আনলে তার শরীরে ময়লা লাগে, আজীবন সে দুর্গন্ধ পায়। তার জীবনটাই বিষিয়ে যায়। সারাজীবন নিজেকে অশুচি মনে করে।"

"মামলায় জিতলে, তিনটে লোকের জেল হলেই অমনি দুর্গন্ধ উঠে যাবে, শুচি হয়ে যাবে ? কি আজেবাজে কথা বলছ তুমি ?"

"তাই বলে অপরাধী শাস্তি পাবে না ?"

"নিশ্চয় পাওয়া উচিত। শাস্তির ভয় না থাকলে তো মানুষ যা খুশি তাই করতে শুরু করবে। বহু অপরাধই চাপা থাকছে তাই শাস্তি পায় না কিন্তু যেগুলো জানা যাচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে সেগুলোর শাস্তি হওয়া নিশ্চয় উচিত ! কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা তো অন্যরকম। বাস্তব বিচার করো, ফলাফলটা কি হতে পারে সেটা ভেবে তবেই পা বাড়াও। তিনটে লোককে শাস্তি দিতে গিয়ে আরো পাঁচ-ছ'টা মানুষ মরবে ! এটা কি কোন কাজের কথা হল ?····বী প্র্যাক্টিক্যাল।"

"তা হলে ওকে গুণ্ডাদের দাবীই মেনে নিতে হয়।"

"হ্যাঁ, তাই-ই, আর দু হাজার টাকাটাও যেন না ছাড়ে। ইজ্জত, পবিত্রতা, শুচিতা রক্ষার সময় এটা নয় বাবা, আগে চেষ্টা করো বাঁচার তারপর ওসব নিয়ে ভাবা যাবে। এতে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া হবে ঠিকই কিন্তু দেশটা যে জায়গায় এখন এসে পড়েছে তাতে আরো অন্যায় হবে এই দুর্বল অসহায় মেয়েটাকে যুদ্ধ করতে ঠেলে দিলে। তুমি ওর বাবাকে বলো, এখান থেকে ওকে সরিয়ে দিক

আর কোর্টকে জানাক মামলা আর চালাতে চায় না।"

হিতু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রিয়ব্রত একদৃষ্টে টেবিলের দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে। চিন্তা করার উপাদানগুলোকে সে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে যতই সাজাবার চেষ্টা করছে ততই এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। হিতুকে সে আসলে বলতে চেয়েছিল, নীচের ঘরে নিরুকে কয়েকটা দিন থাকতে দেবে, এতে ওর আপত্তি আছে কি না?

অথচ কথায় কথায় সে পবিত্রতা, শুচিতা এনে ফেলে অপরাধীদেব শাস্তি পাওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ল! হঠাৎ সে কেন দুষ্টের দমনের জন্য উত্তেজিত হল তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ সে খুঁজে পাচ্ছে না। এতে যে খুদি কেলোর গোটা পরিবারটাই বিপদে পড়বে, এই বোধটাই হারিয়ে ফেলে সে অবাস্তব কথাবার্তা বলল। ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে হয়তো অন্যায় সম্পর্কে একটা প্রতিবাদ তার মধ্যে জমা ছিল সেটাই এখন উছলে উঠেছে কিংবা তার নিজের অন্যায়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠতে। ফণী পালেব মারা যাওয়াতেই কি তার সাহস বেড়ে গেল? এটাই কি নতুন জগতে তার বেরিয়ে আসা?

যখন হিতু বলল, 'বহু অপরাধই চাপা থাকছে তাই শাস্তি পায় না,' তখন বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। প্রিয়ব্রত জানে সারা জীবনই তার বুক মাঝে মাঝে ছ্যাৎ করবে। তিনকড়ি কেন বেঞ্চে জায়গা বদলাতে চেয়েছিল বা নিরুর শেষবারেব চাহনিতে কি কথা বলা ছিল, কোনদিনই সে যেমন জানতে পারবে না, তেমনি বাসে কাল নিরুর পাছা তার উরুতে যখন চাপ দিচ্ছিল তখন তার শরীর মঙ্গলার স্মৃতি থেকে কতটা সরে গেছিল, তাও সে বলতে পারবে না।

শোবার আগে আলো নিবিয়ে সে জানলায় দাঁড়াল। আকাশ ঘোলাটে। চাঁদ যে উঠেছে সেটা বোঝা যাচ্ছে বাড়িগুলোর এবড়ো-খেবড়ো মাথার ছায়া থেকে। একটু পরে নীরুদের ছাদটার অন্ধকার আবছা হবে। ওখানে কেউ দেয়ালে ঠেস দিয়ে যে বসে নেই, প্রিয়ব্রত তা জানে।

বিছানায় শুয়ে সে ঠিক করল, কাল সকালেই সে খুদিকেলোর সঙ্গে কথা বলতে ওদের বাড়িতে যাবে। ওকে বলবে · আজ কোর্টে যাসনি, ডুব মেরে দে। পুলিস খুঁজতে এলে বলবি মেয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কোথায় গেছে কেউ তা বলতে পারছে না।....আর শোন, নিরুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দে। ওকে আমি লুকিয়ে রেখে দেব। কাকপক্ষিতেও জানতে পারবে না।

আমার ছেলে হিতু, লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট, অত্যন্ত ম্যাচিওরড, আমাকে ভালবাসে খুব। ওর জনাই আমি আর বিয়ে করিনি। আমার এই স্যাক্রিফাইসটা

ওকে বোধ হয় খোঁচায়। তাই নিরু সম্পর্কে ও আপত্তি করবে না। ও আমাকে কখনো তুঙ্গে দেখেনি। ও আমাকে মদের মত করে জীবনটাকে চুমুকে চুমুকে খেতে দেখেনি।....এসব কথা থাক, মোদ্দা ব্যাপার হল, নিরুকে আমি লুকিয়ে রেখে দেব। ও আর কখনো রেপড হবে না, খুন হবার ভয় পাবে না....খুদিকেলো বী প্র্যাক্টিক্যাল, অতগুলো মেয়েকে তোর পার করতে হবে!.....ফণী পাল মরে গেছে, আমি এখন মুক্ত, আমি এখন নিজেকে ঝাঁকাতে পারি। ছাব্বিশ বছর ধরে একটা খোলসের মধ্যে ঢুকে আছি।এবার ওটা আমি ভাঙব। তুই আমায় একটু সাহায্য কর....নিরুকে পাঠিয়ে দে। .....আমার কাছে বেঁচে থাকবে...নিরু শব্দ করে দরজা বন্ধ করেনি, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কাঠের সঙ্গে কাঠের ধাক্কা লাগার শব্দটা খুব দরকার।.....

॥ ৪ ॥

"খুদিকেলো বাড়িতে নেই?"

প্রিয়ব্রত প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করল। ঢোলা ময়লা ফ্রক পরা মেয়েটিও দ্বিতীয়বার বলল, "বাবা বেরিয়ে গেছে।"

"আজই তো কোর্টে কেস উঠবে?"

"জানি না।"

"আচ্ছা তোমাব দিদি, নিরুকে একবার ডেকে দাও। বলো পিছনের বাড়ির প্রিয় কাকা ডাকছে।"

"অরু, ভেতবে একবার আয় তো।"

স্ত্রীলোকেব তীক্ষ্ণ স্বর, প্রায় ধমকের মতই বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল। মেয়েটি মুখ ফিবিয়ে পিছনে কাউকে দেখল তারপর প্রিয়ব্রতর মুখের দিকে তাকিয়ে আলতোভাবে দরজার পাল্লাটা ভেজিয়ে দিল। বাজারের থলিটা চার ভাঁজ করে মুঠোয় চেপে সে অপেক্ষা করতে লাগল। ভিতরে চাপা গলায় কেউ কথা বলছে, বোধ হয় খুদিকেলোর বৌ-ই হবে।

ভেজানো পাল্লাটা সন্তর্পণে আবার খুলে গেল। মেয়েটি ধীর গলায বলল, "দিদি বাড়ি নেই। বাবা ওকে নিয়ে ভোরেই বেরিয়ে গেছে।"

পাল্লাটা বন্ধ কবে দিচ্ছিল, প্রিয়ব্রত ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, "এক্ষুনি ফিরবে কি?"

"তা কিছু বলে যায়নি।" মেয়েটির দুটি চোখ আর পায়ের একটা পাতা শুধু দুই পাল্লার মাঝে দেখা যাচ্ছে। তাকে সন্দেহ করছে। আজকের দিনটা এই

বাড়ির লোকেদের কাছে খুবই ভয়ের। যে কোন অপরিচিতই এদের কাছে সন্দেহজনক। তাই বলে কি তাকে ভেবেছে 'ওদের' দলেরই কেউ ? কিন্তু সে তো পিছনের বাড়ির লোক। এই মেয়েটি ছাদ থেকে তাকে নিশ্চয়ই দেখেছে।

"দরকারী একটা কথা ছিল,..... আচ্ছা, পরে আসব। দিদিকে বোলো আমি খোঁজ করছিলাম।"

পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল নিঃশব্দে। দু'পাশে দেয়াল, আর নীচু ছাদের সুড়ঙ্গটা দিয়ে প্রিয়ব্রত রাস্তার দিকে তাকাল। ঝকঝকে রোদের মধ্য দিয়ে মানুষ হাঁটছে। সাইকেল গেল, রিক্সা গেল। অথচ গলির মধ্যে কোন শব্দ নেই।

বাজার করে, খেয়ে তাকে অফিস যেতে হবে। দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে তার মনে হল, নিরু বাড়িতেই রয়েছে। ইচ্ছে করেই দেখা করল না। হয়ত ভেবেছে দেখা করে কোন লাভ নেই। এই লোকটাব কাছে আশ্রয় চেয়েছিল। পরিষ্কার বলে দিয়েছে 'হয় না, হয না। তুমি এখনো ছেলেমানুষ, ঠিক বুঝবে না।'

এখন নিরুব বয়স কত ? হিতুর বয়সীই হবে। বাইশ বা তেইশ, কিন্তু আরো ছোট দেখায অপুষ্টির জন্যই। ওর কাঁধে হাত রেখে কথা বলতে বলতে সে একবারই শুধু মুঠোর মধ্যে হাড় মাংস চেপে ধরেছিল। কি পাতলা, নরম ওর কাঁধের হাড়। মুঠোয় আব একটু জোর দিলে বোধ হয় ভেঙেই যেত!

নিরু কি কিছু আঁচ করেছিল ? মেয়েদের তো বাড়তি একটা অনুভব ক্ষমতা থাকে। তার হাত তখন ও আঁকড়ে ধবে বলেছিল, 'কেন হবে না ?' এটা কি ওর দাবী ? কিছু কি টের পেয়েই এই দাবী জানিয়েছিল ? হাত আঁকড়ে ধরার মধ্যে কিছু খোঁজার চেষ্টা ছিল ? তখন প্রত্যাখ্যান করেছি, প্রিয়ব্রত বাজারের ফটকের সিঁড়িতে জল-কাদায় সাবধানে পা ফেলে উঠতে উঠতে ভাবল, তখনও জানতাম না ফণী পাল মারা গেছে। তখনও জানতাম না হিতু বলবে, 'একই ভাবে বছরের পর বছর..... !'

"বাবু মজফ্‌ফরপুরের লিচু, দশ টাকা, দশ টাকা কেজি।.....খোসায় মোড়া রসগোল্লা, মাত্র দশ।"

হিতু লিচু ভালবাসে। প্রিযব্রত উবু হয়ে বসে বলল, "পাঁচশো। পাতা-টাতা একটু কম দিও।"

ভৌমিক এল সাত মিনিট দেরীতে। হাজিরা খাতায় সই করে নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, "এত দিন চাকবি কবছি, এই প্রথম আপনাকে ক্যাজুয়াল নিতে দেখলুম। গুরুতর কিছু হয়েছে কি ?"

"নাহ্‌হ্‌, সেরকম কিছু নয়, এমনিই। ইচ্ছে হল ডুব মারব, উইক ডে-তে বাড়িতে কেমন লাগে দেখব, দুপুরে ঘুমোব।" সে ছুটির দরখাস্তের ফর্মে কারণ দেখাবার ঘরটা ফাঁকা রেখেছে। এক দিন কামাইয়ের জন্য এই সব কথা লিখবে কি না সে ভেবে পাচ্ছে না।

"আচ্ছা ভৌমিক, কি লেখা যায় বল তো?"

"কিসের লেখা?"

"কাল যে আসিনি তার একটা কারণ তো লিখতে হবে!"

"ডায়ারিয়া।"

"এটা একটা বিশ্রী কারণ।"

"ক্যাজুয়ালের আবার বিচ্ছিরি সুচ্ছিরি কি? দরখাস্তটা তো আর কাগজে ছেপে বেরোবে না যে পাঁচটা লোকে জেনে যাবে আপনার পেট ছেড়েছিল! অতুলদা বুঝলেন, হাস্যকর এই নিয়মটা। আরে বাবা, আমার ছুটি নেবার অধিকার আছে তাই আমি নিচ্ছি, এ জন্য আবার কারণ দর্শাতে হবে কেন? এইরকম বাজে ফর্ম্যালিটিজ সরকারী অফিসে কত যে আছে!... যা খুশি লিখে দিন। কাকা বা জ্যাঠা আছেন কি? না থাকলে লিখুন, ডেথ অফ মাই আঙ্কল্‌।.....এটা পছন্দ হচ্ছে?"

"ওহ্‌ ভৌমিক, আমার সেই দাদা, যিনি টাকা নিতে আসেন।"

"খোঁজ নিয়েছেন?"

"ক্যানসারে মারা গেছেন, দিন কুড়ি আগে।"

ভৌমিকের চোয়াল, খবরটার আঘাতে ঝুলে পড়ল। প্রিয়ব্রত লক্ষ্য করল, শুধু মুখ নয় বসার ভঙ্গিটাও বদলে গেল। শিরদাঁড়াটা আলগা হয়ে দেহটা ইঞ্চিখানেক বসে গেল, কাঁধটাও ঝুকে গেছে। চোখের সাদা অংশটা প্রকট।

"এই একটা রোগ দাদা, বড্ড ভয় করে। কখন যে এসে ঘাড় মটকাবে, কেউ বলতে পারে না।"

"অত ভয় পেলে চলে না ভৌমিক। যার যেমন আয়ু ভগবান দিয়েছেন, সে ঠিক তত দিনই বাঁচবে, ক্যানসার কিসসু করতে পারবে না।"

"না দাদা, আমার আঠাশ বছরের ভাই ওয়েটলিফটার ছিল। এক দিন জিমন্যাসিয়াম থেকে ফিরল কাঁধে চোট নিয়ে। বারবেল মাথার উপর তুলেই পা স্লিপ করে। ঘাড়ের উপর বারবেলটা পড়ে। ব্যথা আর সারে না। চার মাস পর ধরা পড়ল ক্যানসার হয়েছে তখন আর চিকিৎসা করার কিছু ছিল না। কি বিউটিফুল বডি যে ছিল! তেরো বছর হয়ে গেল মারা গেছে, এখনো চেহারাটা

চোখের সামনে ভাসে। কে ভেবেছিল এমন রোগে·····।"

ভৌমিক ধীরে ধীরে মুহ্যমান হয়ে, একদৃষ্টে খোলা দরজা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল। প্রিয়ব্রত তখন দরখাস্তে লিখল : ডায়ারিয়া।

"আপনি জানলেন কবে ?" ভৌমিক নিজেকে সামলে তুলেছে।

"কালই। ওর বাড়িতে গেছিলাম খোঁজ নিতে। স্টমাকে হয়েছিল।·····শোনামাত্র আমি তোমার মতই ভয় পেয়ে গেছিলাম। তার পর মনে হল, ভয় পেয়ে আমার হবেটা কি ? আমি কি ভয় পাওয়ার যোগ্য ? যাদের অনেক কিছু পাওয়ার, ভোগ করার আছে তারাই মরতে ভয় পাবে। আমি গত পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে একই রাস্তায় হেঁটে গিয়ে বাজার করেছি, একই রুটের বাস ধরেছি, একই চেয়ার টেবিলে কাজ করেছি, একইরকম লোকেদের সঙ্গে বাসে ফিরেছি, দিনের পর দিন। আমি কোনদিনই ডিরেক্টর হতে পারব না, ম্যানেজার হতে পারব না, এমন কি বড়বাবুও নয়। তা হলে আমার ভয় পাওয়ার কোন যুক্তি আছে কি ?"

প্রিয়ব্রত অফিসে এই প্রথম টানা এতক্ষণ কথা বলল। বলার সময় মনে হচ্ছিল, হিতুই যেন তার মুখ দিয়ে কথা বলছে। সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল।

"তাই বলে আপনি মরার ভয় পাবেন না ?"

ছেলেটা সজল দত্তর টেবিলে খালি কাপ রেখে কেটলি থেকে চা ঢালছে। অফিসে এসেই অনেকে চা খায়। প্রিয়ব্রত প্রথম কাপ খায় বারোটায়। কিন্তু এখন তার খেতে ইচ্ছে করল।

"অ্যাই খোকা" সে চেঁচিয়ে ডাকল, "এখানে দুটো চা দিয়ে যা।"

"অতুলদা, আমি এখন খাব না।"

"আরে খাও এক কাপ, এখন খেলে ক্যানসার হবে না।"

প্রিয়ব্রত অফিসে কখনো কাউকে চা খাওয়ায়নি, কারুর দেওয়া চা খায়নি। আজ ব্যতিক্রম ঘটল।

"ভৌমিক তোমার তো চল্লিশ হয়েছে। এখন তুমি জীবনের তুঙ্গে রয়েছ। হিসেবনিকেশ করার সময় এটাই, করেছ কি ?"

"না দাদা, অঙ্ক-টঙ্ক আমার একদমই মাথায় ঢোকে না। হাসি পেলে হাসি, কান্না পেলে কাঁদি এর মধ্যে আবার হিসেবটিশেব করার কি আছে ?"

দু'জনকে দু'কাপ চা দিয়ে গেল ছেলেটা। চুমুক দিয়ে প্রিয়ব্রত দেয়ালে ঘড়ির দিকে তাকাল। কোর্ট নিশ্চয় এতক্ষণে বসে গেছে। ওদেরটা কখন উঠবে ? এই ধরনের কেস সাধারণত প্রথম দিকে ওঠে না কিন্তু হাজির থাকতে হবে দশটা

থেকেই। নিরুকে নিয়ে খুদিকেলো অপেক্ষা করছে। নিশ্চয় কোর্টরুমের মধ্যে বাইরে থাকলে 'ওরা' কিছু একটা করে ফেলতে পারে। পুলিস আর কি করবে যা গিজগিজে ভিড় থাকে। একটা লোক ছুটে পালাতে চাইলে অনায়াসেই পালাতে পারবে। সিটি সেশনস কোর্টেই তো এখন মামলা নাকি ব্যাঙ্কশালে ? এটাই তো খুদিকেলোকে জিজ্ঞাসা করা হয়নি!

এইরকম বোকামি কতবার যে সে করেছে। কাল পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার কি কোন দরকার ছিল ? সে কি ইচ্ছে করেই এইভাবে উঠেছিল আচমকা কিছু দেখে ফেলার আশায় ? বৌটি বেশিরভাগ সময় ব্লাউজ পরে না এটা সে জানত। কিন্তু খোলা দরজার সামনে ঘর মুছবে কোমর থেকে শরীরটাকে ঝুঁকিয়ে, এটাও কি সে জানত ? গলা খাঁকারি না দিয়ে বোকামিই করেছে। ···হিতু ইদানিং ঝাঁঝালো মেজাজে কথা বলছে। আমার মধ্যে অপছন্দ করার অনেক কিছুই ও পাচ্ছে।

···'তোমার কি সময় কাটাবার আর কিছু নেই ?' হঠাৎই তিরিক্ষে হয়ে ওঠে, সব ব্যাপারেই খোলাখুলি, স্পষ্ট, চটপট চায়··· 'এমনিতেই তো তুই একটু থপথপে ধবনেব, স্লো'··· কেউ তোকে দলে নিতে চাইত না ··চোখ বুঁজে তোকে কাটাতুম।' খুদিকেলোকে মৌলালির মোড়ে দেখামাত্রই তার পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তা হলে ফণী পালের মবাটাকে সে শুধু একমনে চুমুকে চুমুকে উপভোগ করতে পারত, নীক চিরকাল অজানাই থেকে যেত।

প্রিয়ব্রত টেবিলের ড্রয়ারে চাবি ঢোকাল। আড়চোখে ভৌমিকের দিকে তাকিয়ে মনে হল চট করে যেন চোখ সরিয়ে নিল। এতক্ষণ ও তাকেই লক্ষ্য করছিল কি ? চাবি ঘুরিয়ে সে ড্রয়ারটা সামান্য টেনে সাদা খামটাকে দেখতে পেল। এবার থেকে আর খামের মধ্যে টাকা ভরে তাকে অপেক্ষা করতে হবে না।

"জানো ভৌমিক, প্রতি মাসের পয়লা তারিখে টাকাটা দেবার জন্য অপেক্ষা করতাম। কি রকম একটা অভ্যাসের মত হয়ে উঠেছিল। বহু বছরের অভ্যাসটা কাটিয়ে উঠব ঠিকই তবে যত দিন অফিস করব মাসের পয়লা তারিখে ওকে মনে পড়বেই। তোমারও বোধ হয় মনে পড়বে।"

"পড়বে। প্রত্যেক পয়লার সাড়ে চারটে বাজলেই আমার চোখ, কেন জানি দরজার দিকে চলে যেত। আশ্চর্য, অথচ আমার সঙ্গে কোনদিনও আলাপ পরিচয় হয়নি! কি জানি একটা ব্যাপার ওনার মধ্যে ছিল!"

বেয়ারা এসে ভৌমিকের টেবিলে দাঁড়াল। "বড়বাবু বললেন, কাল যে

ফাইলটা উনি দেখতে পাঠিয়েছিলেন সেটা বারোটার মধ্যে চাই। ডি এল আর ওটা নিয়ে রাইটার্সে যাবেন।"

ভৌমিক ব্যস্ত হয়ে পড়ল। প্রিয়ব্রত সন্তর্পণে ড্রয়ারটা টানল। খামটা এখানেই রেখে দেবে না বাড়ি নিয়ে যাবে ? শুধু কি ফণী পালের মধ্যেই একটা ব্যাপার ? আলতো হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। এখন তাব নিজেকে সুখী মনে হল। বহু বছর পর অফিসটাকে আঁকড়ে ধরে সময় কাটাবার জায়গা বলে আর তাব মনে হচ্ছে না। বাইরেও একটা জগৎ তার জন্য অপেক্ষা করছে।

স্বদেশ সরকার এল সাড়ে চারটে নাগাদ।

"অতুলদা, একটা চিঠি লিখব, ছাপিয়ে দিতে হবে।"

প্রিয়ব্রত প্রশ্ন নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল।

"আপনার ছেলেকে বলবেন একটু ?"

"হিতুর তো ইংরিজি কাগজ !"

"আমি ইংরিজিতেই লিখব। কেন, পারি না ভেবেছেন ?

"না না, আমি বলছি না যে পার না তবে ওদের কাগজে চোস্ত, মানে খুব স্মার্ট ইংরিজি না হলে— ।"

প্রিয়ব্রত ঠোঁটের কোণের হাসিটাকে ঠেলে নিয়ে গেল চোখের কোণে। 'ডেঞ্জারাস লোক এই স্বদেশ সরকার।' কই এখন তো মনে হচ্ছে না ! কি রকম মিনমিনে, আমতা আমতা ভাব চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে।

"চিঠি কি নিয়ে ?"

"মশা নিয়ে। কি ভীষণ বেড়েছে বলুন তো !"

ভৌমিক মুখ নিচু করে লেখায় ব্যস্ত। মুখ না তুলেই বলল, "আমাদের বেলেঘাটায় যা অবস্থা, সন্ধের পর পাগল হয়ে যেতে হয়। ধূপ জ্বালিয়ে, ম্যাট পুড়িয়ে, স্প্রে করে, সবই দেখেছি, ব্যাটারা ইম্যিউন হয়ে গেছে।"

"কই আমাদের ওদিকে তো মশা নেই !" প্রিয়ব্রত অবাক হবার ভাণ করল। ওদের কথার তালে তাল দিয়ে এতকাল কথা বলে এসেছে। এবার সে নিজেকে জানান দেবে। মুখ নীচু করে থেকে আর ঘাড় নেড়ে এতগুলো বছর তো কাটল ! ডেঞ্জারাস লোক···হাঁড়ির খবর, লুকোন খবর, জানার আগ্রহ নাকি বড় বেশি। মোগল বংশ নীলরতনের ফ্রি বেডেই শেষ হয়ে গেছে তো কি হয়েছে ? তাতে তোর এত মাথা ব্যথা কেন ? বাহাদুর শা কততম বাদশা, কে তা জানতে চায় ! এই সবই তো ওর হাঁড়ির খবর !

"কি জানি, আপনি নর্থ ক্যালকাটায় থেকেও মশার কামড় খাচ্ছেন না, এটা

একটা খবর !" ভৌমিক এবারও মুখ তুলল না।

"অতুলদার রক্ত বোধ হয় ওদের কাছে টেস্টফুল নয়।"

"বোধ হয় তাই। কিন্তু স্বদেশ, চিঠি ছাপালে কি মশা উধাও হবে ?"

"হবে না। কিন্তু কর্পোরেশনের, গভরমেন্টের টনক তো নড়াতে হবে। মশার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে চিঠি যদি কাগজে বেরোয়, দেখবেন কিছুটা কাজ হবে।"

"কই চিঠিটা দাও।"

"এখনো লিখিনি, কাল আপনাকে দেব।"

"টাইপ করে দিও।"

স্বদেশ উঠে যাবার পর সে আবার সাদা খামটার কথা ভাবল। পাঁচশো টাকা ওতে রয়েছে। টাকাটা নিয়ে সে বাড়ি যাবে নাকি ফণী পালের স্মৃতি হিসেবে ড্রয়ারেই রেখে দেবে ? পাঁচশো টাকার খুব কিছু দরকার তার নেই। হিতু চাকরি করছে। ওটা তা হলে স্মৃতি হয়েই থাক। প্রত্যেক দিন ড্রয়ার খুলে খামটা দেখলেই তার মনে পড়বে, কিভাবে ভয়ের চোয়ালের মধ্যে বাস করে অবশেষে সে ছাড়া পেয়েছে। কিন্তু এখনো সে পুরোপুরি মুক্তি পায়নি। মাসে মাসে টাকা আর দিতে হবে না কিন্তু ধরা পড়ার ভয়টা রয়েই গেছে।

কে তাকে ধরে ফেলতে পারে ?

ছুটির পর রাস্তায় বেরিয়ে আসার সময় অফিসের লোকেদের মুখগুলো সে লক্ষ্য করল। কারুর সঙ্গেই তার আলাপ নেই কিন্তু মুখ চেনা। অযথা কথা বলার মত সম্পর্ক শুধু তার ঘরের তিন-চারজনের সঙ্গেই। কয়েকজনকে মনে হয়েছে তার মতই, মুখে কোন ভাব নেই, মুখ বুঁজে সামনে তাকিয়ে অফিসে ঢোকে আর বেরোয়।'....ছাইগাদার লোক।

রাস্তা পার হবার জন্য মৌলালির মোড়ে দাঁড়িয়ে তার নিরু আর খুদিকেলোকে মনে পড়ল। আজ কি ওকে জেরা করা হয়েছে ? তিনটে লোক দেখিয়ে কি জানতে চাওয়া হয়েছে, এরাই তোমাকে—।

নিরু কেন নিজের সর্বনাশ নিজে করবে ? 'মরি মরব তোমাদের কি ?'—এই কথাটার মানে, সে জেদ ধরেছে সনাক্ত করবে। বাড়িতে তাকে নিশ্চয় বারণ করেছে। ঠিকই করেছে। হিতুও তো তাই বলল, যুদ্ধু করাটা এখন বোকামি।

আকাশে তাকিয়ে সে মেঘ খুঁজল। সেদিন কালবৈশেখি আসার কথা ছিল। আজও কাগজে তাই লিখেছে। কিন্তু কোথায় মেঘ ? ভিড় বাসেই ওজনের কোর্ট থেকে ফিরতে হবে। নিরু বসার জায়গা না পেলে বাসে কিভাবে

দাঁড়াবে ?.....ওর পিছনে যে লোকটা থাকবে তার স্বভাব কেমন হতে পারে ?.....কিন্তু সে তো ইচ্ছে করে নিরুর গায়ে গা লাগায়নি। পকেটমার হবার ভয়ে তার বাঁ দিকটা চেপে দাঁড়াতে বলেছিল। ভিড়ের জন্য সে কোন সুযোগ নেয়নি। তার স্বভাবে এসব প্রবৃত্তি নেই।

প্রিয়ব্রত বাসে উঠল এবং কুড়ি মিনিট পর যখন নামল, তার মধ্যে সে বাসের ঠিক মাঝখানে, লেডিজ সিট থেকে দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থেকেছে। হাতিবাগানে সে দশটা সোনপাপড়ি কিনল। হিতু বেশি মিষ্টি পছন্দ করে না তবে সোনপাপড়িটা খায়।

সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু পার হয়ে সে দাঁড়িয়ে মিনিটখানেক ভেবে গুপী বসাক লেনে না ঢুকে, তার পাশের রাস্তা ধরল। মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সে দূর থেকে দেখল খুদিকেলোর দোকানের দরজা খোলা, আলো জ্বলছে। কাছাকাছি এসে দেখতে পেল পাটি পাতা মেঝেয় উবু হয়ে বসে ও কাঁচি দিয়ে গোলাপি একটা কাপড় কাটছে। অবাঙালি এক স্ত্রীলোক বসে দেখছে।

"আজ তো তোদের কোর্টে কেস ছিল, কি হল ?"

খুদিকেলো মুখ তুলে তাকে দেখে ভ্রূ কুঁচকেই মুখ নামিয়ে নিল। প্রিয়ব্রত ওর এই নিস্পৃহ ভাবটা আশা করেনি। মুখ গম্ভীর করে ফেলেছে, পিঠটাও আর একটু কুঁজো হয়ে গেছে, দৃষ্টি কাঁচিতে আটকে রয়েছে। তার উপস্থিতিটা যেন পছন্দ করছে না, উত্তর দেবার ইচ্ছাটাও নেই।

"নিরুকে জেরা করবে বলেছিলি, করেছে ?"

"না।.....তারিখ পড়েছে, ও মাসে হবে।"

মুখ না তুলে কাঁচি চালাতে চালাতে খুদিকেলো স্বগতোক্তির মত কথাটা বলে স্ত্রীলোকটির উদ্দেশ্যে বলল, "বলামাত্র কি বানিয়ে দেওয়া যায়, হাতে অনেক কাজ, কাল সকালে এসো।"

"বাচ্চা মেয়ের ফরক, কতক্ষণ আর লাগবে ! দাও না বাবু।"

"বাচ্চারই হোক আর বুড়োরই হোক সময় তো লাগবে। আজ সারাদিন দোকান বন্ধ ছিল, হাতের কাজ বাকি পড়ে আছে.....এখন আমার কথা বলার সময় নেই, কাল এসো।"

"আজ তা হলে হল কি ? প্রিয়ব্রত কুণ্ঠিত মৃদু গলায় বলল। বিরক্তিটা মুখ থেকে না সরিয়েই খুদিকেলো তার দিকে তাকাল।

"কি আবার হবে, কিছুই হয়নি।"

প্রিয়ব্রত কুঁকড়ে গেল ওর স্বরের রুক্ষতায়। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে এই

লোকটাই তার হাত ধরে বলেছিল 'এই সামান্য উপকারটা তোকে করতেই হবে', এখন সেটা ওকে মনে করিয়ে দিলে কেমন হয় ! কিন্তু সে জানে তার মনের মধ্যে কোথায় যেন গণ্ডি কাটা রয়েছে, তার কিনার পর্যন্ত গিয়ে কিছুতেই আর সেটা পার হয়ে যেতে পাবে না।

"আজ সকালে তোর খোঁজ করতে বাড়িতে গেছিলাম।"

"জানি। কেন, কি জন্য ?.....নিরুর খোঁজও করেছিলি। কেন, ওকে তোর কি দরকার ?"

খুদিকেলোর মুখে নোংরা ভাঁজ পড়েছে। প্রিয়ব্রত সন্ত্রস্ত চোখে, সেই ভাঁজের নীচে যে ইঙ্গিত লুকোন রয়েছে, সেটা দেখতে পেল।

"ওর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল খুব ভয় পেয়েছে। আমার একতলায় খালি ঘরে ও লুকিয়ে থাকতে চেয়েছিল। তখন আমি রাজি হইনি। কিন্তু পরে মনে হল এখন ওর লুকিয়ে পড়াই উচিত তাই.....আমার বাড়িতে এসে—।"

"তোর বাড়ি থেকে ফেরার পরই ওর মতিগতি বদলে গেল। মা, বাবার কথা বাদই দিচ্ছি। এমন কি ছোট বোনগুলো পর্যন্ত ওর পায়ে ধরল। কিন্তু গোঁ ধরেই রইল—" খুদিকেলো গলা নামিয়ে দিল, "'আমি বাঁচতে চাই না'। শুধু ওই এক কথা.....তুই কি মন্তর দিয়েছিলি ওর কানে ?"

"আমি !" প্রিয়ব্রতর দুটো পা থরথর কেঁপে উঠল। হাতের বাক্সটা দুমড়ে গেল মুঠোয়। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে রয়েছে। কথা বলতে গিয়ে স্বর বেবোল না। স্ত্রীলোকটি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে।

"মরতে চাইছে.....তুই ওকে অপমান করেছিস।"

"না, না—।"

"তোর আবার বিয়ে করা উচিত ছিল, তা হলে এই অধঃপতন হত না।"

প্রিয়ব্রত ততক্ষণে হাঁটতে শুরু করেছে। রাস্তায় আলো। গরমের জন্য লোকজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তার মনে হচ্ছে সব্বাই বোধ হয় শুনেছে খুদিকেলোর শেষের কথাগুলো, সবাই তার দিকে তাকাচ্ছে। এখন কেন লোডশেডিং হচ্ছে না ?

বাড়িতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সে পায়ের শব্দ করল। দোতলার ঘরের দরজা বন্ধ। তিনতলায় পৌঁছে সে সোনপাপড়ির বাক্সটা তিলুর হাতে দিয়ে বলল, "দাদার জন্য।"

"আদ্ধেক লিচু দাদা খেয়ে গেছে, বাকিগুলো আপনাকে খেয়ে নিতে বলেছে।"

"তুই খেয়েনে, আমার শরীর ভাল নয়।"

ঘরের আলো জ্বালার আগে সে জানলায় দাঁড়াল। অন্ধকাব ছাদ। বোঝা যাচ্ছে না কোন মানুষ আছে কি না। 'তুই ওকে অপমান করেছিস', এই ধারণাটা খুঁদিকেলোকে দিল কে ? নিরু ! মেয়েদের একটা বাড়তি অনুভব ক্ষমতা আছে। তার মধ্যে নিরু কিছু আবিষ্কার করেছিল কি ? কিছু কি ধরা পড়েছিল ওর কাছে ! ও হাত আঁকড়ে ধরে ছিল কিসের ভরসায় ? প্রত্যাখ্যান পাবে না ভেবেই কি বলেছিল 'কেন হবে না ?' একটা মেয়ের বাঁচতে না-চাওয়ার মানে কি সে অপমানিত হয়েছে ! কতরকম কারণেই তো মানুষ মরতে চায়। সে নিজেও তো নিজেকে অপমান করেছে জাল অতুলচন্দ্র ঘোষ হয়ে। কিন্তু মরার জন্য তো ব্যস্ত হয়নি কখনো।

আধ ঘণ্টা পর, বালিশে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে প্রিয়ব্রত টি ভি-র দিকে তাকিয়ে। একটা নাটক হচ্ছে। কিছু শব্দ আর চলমান কিছু অবয়ব ছাড়া তার চেতনায় আর কোন ছাপ পড়ছে না। খাটের পিছনে তিলু দাঁড়িয়ে।

পরশুর মৌলালি থেকে শুরু করে সুড়ঙ্গের মত অন্ধকার গলিতে ঢুকে যাওয়া পর্যন্ত নিরুকে সে, পুরনো ফিল্মের রিল হাত দিয়ে টেনে খুলে খুলে দেখার মত করে, তার গলার স্বর, চাহনির ঔজ্জ্বল্য, হাতের অবস্থান, পদক্ষেপ, কুণ্ঠা, চোখের পাতা নামিয়ে ফেলা, ছলছলানি, তীব্র দৃষ্টি, অনুনয়—প্রতিটিই সে ফ্রেম ধরে ধরে দেখে যাচ্ছে। কখনো বা একটা ফ্রেম দুবার, তিনবারও দেখছে। কিন্তু কোথাও সে খুঁজে পাচ্ছে না ইঙ্গিতটা—নিরু কেন জীবন সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল !

অপমানের কথাটা যে খুঁদিকেলোরই মন-গড়া তাতে প্রিয়ব্রতর সন্দেহ নেই। অতি চতুর, শয়তানি বুদ্ধিতে ওর মাথাটা ঠাসা। হয়তো এটাই চাউর করবে, প্রিয়, তার বাল্যবন্ধু, বাবার বয়সী একটা লোক, কুপ্রস্তাব দিয়েছে তার মেয়েকে। নিরু তার সম্পর্কে খাবাপ কিছু বাড়িতে বলেনি, এটা সম্পর্কেও সে নিশ্চিত। আট মাসে যতটা কঠিন হয়ে ওঠা উচিত ছিল মেয়েটি তা হতে পারেনি। এখনো অল্প বয়সের আবেগ ওকে দুলিয়ে দেয়....'আমি তখন বললুম, আপনারা যে মেয়েটার সব্বোনাশ করলেন, তার জীবন নষ্ট করে শেষ করে দিলেন—' ; নিরুর পক্ষে মিথ্যে বলা সম্ভব নয়।

'কাকিমা আমায় রাখতে রাজি হল না', ...'আমি হলে তো বলতাম থেকে যাও।' .....'হয় না, হয় না তুমি এখনো ছেলেমানুষ, ঠিক বুঝবে না—।'

এতে বোঝাবুঝির কি আছে ? অত্যন্ত সরল, স্পষ্টই তো কথাটা— আমি একটা কাওয়ার্ড, কাপুরুষ। প্রিয়ব্রত চোখ বুঁজল।

"টি ভি বন্ধ করে দোব ? এখন খবর হবে।"

"দে। আমি রাতে আর খাব না। আলোটাও নিবিয়ে দিয়ে যা।"

হিতু যখন কলিং বেল বাজাল তখনো সে জেগে। তিলুর নেমে যাওয়া, উঠে আসা, চেয়ার টেনে হিতুর জুতো খুলতে বসা সে শুনতে পাচ্ছে।

"কোথায় সোনপাপড়ি, বার কর, অনেক দিন খাইনি....বাবা না খেয়েই শুয়ে পড়েছে ?"

দরজায় হিতুর ছায়া। প্রিয়ব্রত বলল, "শরীর ভাল লাগছে না, তাই।"

আলো জ্বেলে হিতু এগিয়ে এল। হাতে বাক্সটা, মুখের মধ্যে সোনপাপড়ি।

"চাইনিজের রি-অ্যাকশন নয় তো ? মাত্র কয়েক ঘণ্টার তো বাসি, ফ্রিজে ছিল। গোলমাল হবার কথা নয়, আমার তো হয়নি !"

"না না, চাইনিজের জন্য নয়, এমনিই মনটা ভাল নেই।"

"আমাদের কোর্ট রিপোর্টারকে বলে রেখেছিলাম, আমার পাড়ার মেয়ে ইনভলভড, যদি উনি এই কেসটা অ্যাটেন্ড করেন। সন্ধ্যেবেলায় তিনি জানালেন কেসের হেয়ারিং হয়নি। খুদিকেলোর মেয়ে সকাল থেকে নাকি হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাই মুলতুবী রইল, সামনের মাসের চার তারিখে আবার হেয়ারিং হবে। বাড়ি ফেরার সময় থানায় গেছিলাম, নতুন ও সি-র সঙ্গে মুখচেনা আছে। শুনলাম খুদিকেলো আজ সকালে থানায় গিয়ে বলেছে, মেয়েকে খুঁজে পাচ্ছে না। ভোররাতে নাকি বাড়ি থেকে চুপিসাড়ে বেরিয়ে গেছে।"

"সে কি !" প্রিয়ব্রত উঠে বসল।

"পুলিস অবশ্য ওর কথা বিশ্বাস করেনি। ভয়েতেই যে মিথ্যে গল্প ফেঁদেছে সেটা ওরা বুঝেছে কিন্তু করবে কি ? ভদ্রলোক যথেষ্ট শিক্ষিত, কালচার্ড, টিপিক্যাল পুলিস নয়। দুঃখু করলেন, খুদিকেলোকে অনেক বুঝিয়েছেনও, পুলিস আপনাদের দেখবে, প্রোটেক্ট করবে, আপনারা ভয়ে পিছিয়ে গেলে এইসব ক্রিমিনালদের তা হলে শাস্তি হবে কি করে ? কিন্তু সেই এক কথা, ভোরবেলায় মেয়ে আমার ঘর ছেড়ে কোথায় যে চলে গেছে, আসলে নিজেরাই কোথাও সরিয়ে দিয়েছে। দু' হাজার টাকাও হয়তো হাতে পেয়ে গেছে।"

আমি দিয়েছিলাম পাঁচ হাজার আর মাসে মাসে দিয়েছি পাঁচশো, একটা ভয়কে শান্ত করে রাখার জন্য। প্রিয়ব্রত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তুইও তো বলেছিলি, নিরুকে এখান থেকে সরিয়ে দিক।"

"হ্যাঁ বলেছি। এখনো বলছি। ফেরোসাস ক্রিমিনাল গ্যাংয়ের সঙ্গে লড়তে যাওয়াটা বোকামি। মেয়েটা পালিয়ে গিয়ে ঠিকই করেছে। পুলিস ও রকম

আশ্বাস সবাইকে দেয়। মরলে মেয়েটা মরবে, পুলিস তো আর মরবে না।......লিচুটা সত্যিই খুব মিষ্টি ছিল, খেয়েছ ?"

"না।"

একটু পরেই হিতুর ঘর থেকে চাপা শব্দে ভেসে এল বিদেশী গান। হিতু প্রায় রাতেই টেপ রেকর্ডার চালায়। কথাগুলোর একবর্ণও সে বুঝতে পারছে না। আসলে সে তার পারিপার্শ্বিককেই মুখস্ত থাকা পদ্যের লাইনের মত পর পর আর স্মৃতিতে পাচ্ছে না। একটা গোলমাল তার মধ্যে যে ঘটে গেছে, এটা সে অনুভব করছে। ফণী পাল আর নিরু, এই দুটো ঘটনার মধ্যে কোনটা যে তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই বুঝে উঠতে গিয়ে কয়েকবার তিনকড়িকে মনে পড়ল।

অনেকগুলো গলার চীৎকারের সঙ্গে একঝাঁক বাজনার শব্দ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে প্রিয়ব্রতকে থাবড়ে থাবড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে। তার মধ্যে ঢাকের মত একটা শব্দ চুপিসাড়ে একঘেঁয়ে বেজে চলেছে। সে ওই ঢপ্ ঢপ্ শব্দটাকে খুঁজে পেয়েই, অনুসরণ করতে করতে ঘুমের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে লাগল। .....সুড়ঙ্গের মত পথটা। ঢপ্ ঢপ্......ঢপ্ ঢপ্.....সে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঢপ ঢপ. ঢপ ঢপ.....সে অপেক্ষা করছে। কাঠের সঙ্গে কাঠের ধাক্কা লাগার মত একটা শব্দ সে শুনতে চায়।

॥ ৫ ॥

প্রিয়ব্রত স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, "আমিই অতুলচন্দ্র ঘোষ।"

কিছুদিন আগে মাথা কামিয়েছে। গোল খুলি ছেয়ে বসে থাকা মশার মত চুল। গাল দুটি সামান্য ফুলো এবং কামানো। চোখের নীচে চামড়া আলগা। পাতা দুটো তন্দ্রাচ্ছন্নের মত নেমে এসে অর্ধেক চোখ ঢেকে রেখেছে। থুতনিটা লম্বা, গলাটাও লম্বা লাগছে পাঞ্জাবী পরার জন্য। গেরুয়া খদ্দরের পাঞ্জাবীর হাতা ঢলঢলে। কাঁধে ঝুলছে কাপড়ের ঝুলি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

একে সে দেখতে পায়, সিঁড়ি থেকে উঠেই ঘরে ঢোকার দরজাটার কাছে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে। ঢুকবে কিনা, এমন একটা প্রশ্নের জবাব খোঁজার জন্য ঘরের প্রত্যেকটা টেবিলের দিকে তাকাল। কয়েকটা চিঠি হাতে অ্যাকাউন্টস ম্যানেজারের খোপ্ থেকে সেই সময় এক বেয়ারা বেরোতেই তাকে ডেকে কি যেন জিজ্ঞাসা করল। বেয়ারাটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেই প্রিয়ব্রতর দিকে তাকিয়ে থেকে, ছোট ছোট পায়ে এগিয়ে আসতে লাগল।

তার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে নম্র এবং বিনীত ভঙ্গিতে বলল, "আপনিই কি

অতুলচন্দ্র ঘোষ ?"

শোনামাত্র তার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বলল "আমিই অতুলচন্দ্র ঘোষ।"

দু' হাতের মুঠো বুকের কাছে তুলে, লোকটি মিষ্টি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, "নমস্কার।"

"নমস্কার।" প্রিয়ব্রত আড়ষ্টভাবে হাতের দুটো পাতা টেবিল থেকে গলা পর্যন্ত তুলল।

"আমার নাম গৌরাঙ্গ পাল, আমার বাবা ফণীন্দ্রনাথ পাল।"

পলকের জন্য প্রিয়ব্রতর মুখ ফ্যাকাশে দেখাল। কেন ? ফণী পালের ছেলে আমার কাছে কেন ? আমার সঙ্গে ওর কি দরকার ? সব তো চুকেবুকে গেছে !

"শুনলাম উনি মারা গেছেন।"

"ক্যানসারে, ও মাসের দশ তারিখে। আপনাকে খবরটা আর দেওয়া হয়নি। এত ঝঞ্ঝাট ঝামেলা, স্কুলের কাজ....কোচিং সামলানো, অথচ আপনার বাড়ি বেশি দূরেও নয়।"

কথা শেষ করার আগেই গৌরাঙ্গ চেয়ারে বসে পড়েছে। প্রিয়ব্রত আড়ে দেখল ভৌমিক চোখ সরিয়ে নিচ্ছে গৌরাঙ্গর মুখ থেকে।

"বাবা ডিরেকশনটা দিয়ে ছিলেন বটে কিন্তু মৌলালিতে নেমে...এদিকটা আমি আবার একদমই চিনি না। ঘোরাঘুরি একটু করতে হল। ....একগ্লাস জল খাওয়াবেন, যা ভ্যাপসা গরম !"

ফণী পালও এসে প্রথমে জল চাইত।

প্রিয়ব্রত গ্লাস নিয়ে নিজেই জল আনতে গেল বারান্দায়। উদ্দেশ্য কি ? আমার বাড়ির, অফিসের হদিশ ফণী পাল ছেলেকে দিয়ে গেছে কেন ?

একচুমুকে গ্লাস খালি করে টেবিলে রাখল। ঠোঁটের কষ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল, কাঁধের কাছে ঘষে মুছে নিল। তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে হাসল।

"ভেবেছিলুম আপনার বাড়িতেই যাব। তারপর ভাবলুম এখানে এলে অফিসটাও দেখা হয়ে যাবে। অনেক চেষ্টায় আজ সময় করে বেরোতে পেরেছি....ছাত্র চরিয়ে খাই।"

"স্কুল মাস্টার ?" প্রিয়ব্রত শুকনো গলায় বলল। মাস্টারমশাইরা নিরীহ হন, ঝামেলায় জড়াতে চান না বলেই তার ধারণা। গৌরাঙ্গর আসার পিছনে কোন মতলব বোধহয় নেই। ওর সারা মুখে কৌতূহল মাখান এক ধরনের সারল্য রয়েছে, এটাই সে এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি !

"বেলগাছিয়ায় ভারতী বঙ্গ বিদ্যালয়ে তেরো বছর পড়াচ্ছি, প্রাইমারি সেকশনে। ওখানেই একটা ঘর নিয়ে কোচিংও চালাই। সেই সকালে বেরিয়ে....শরীরে আর কুলোয় না।"

ওর মুখে ক্লান্তি, অবসাদ ফুটে উঠল। দুটো হাত টেবিলে রেখে ঝুঁকে পড়ল বিশ্রাম নেবার ভঙ্গিতে।

"মা'রও বয়স হয়েছে, শিগ্গিরিই যাবেন মনে হচ্ছে। ....জ্বরজারি, অসুখ বাড়ির সকলের তো সবসময় লেগেই আছে। একমাত্র বাবাই শুধু নিজের অসুখের কথা কাউকে বলেননি। চার মাস চেপে ছিলেন। জানতেন, বলে কোন লাভ নেই। এ রোগের কোন চিকিৎসা তো নেই, মরতেই হবে।"

প্রিয়ব্রত চোখের কোণ দিয়ে ভৌমিককে দেখল। খোলা একটা ফাইলের দিকে একমনে তাকিয়ে। তার মানে উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

"ফণীদা চাপা স্বভাবের ছিলেন।"

গৌরাঙ্গ কথাটাকে অনুমোদন করল মাথা নাড়িয়ে।" চাপা চিরকালই ছিলেন। আমার বাচ্চাবয়স থেকে দেখছি তো, অসম্ভব কষ্ট সহ্য করতে পারতেন।"

এইসব বলার জন্য কি এসেছে ? প্রিয়ব্রত অধৈর্য হয়ে পড়ছে। যদি আর কিছু বলার না থাকে তা হলে এবার উঠুক। কি রকম একটা অস্বস্তি লাগছে ওর কথাবার্তায়। মনে হচ্ছে রক্ত হিম করা রহস্য কাহিনী শুরু করার আগে এসবই যেন ভূমিকা ! মাথা পাশে ফিরিয়ে প্রিয়ব্রত ড্রয়ারের দিকে তাকাল। সাদা খামটা শান্তভাবে পড়ে রয়েছে পিনের বাক্সর গায়ে ঠেস দিয়ে। যেন তার হাতে এখন অনেক কাজ, এখন সে খুব ব্যস্ত, এইরকম একটা ভাব মুখে ফুটিয়ে সে ড্রয়ার হাতড়াতে লাগল একটা দরকারী কিছু খোঁজার জন্য। লোকটা বোকা নয়। এই ইঙ্গিত থেকে নিশ্চয় ও বুঝতে পারবে, এবার তাকে বিদায় নিতে বলা হচ্ছে। ড্রয়ার থেকে লাল নীল পেনসিল, ইরেজার, ডটপেনের রিফিল এবং খামটা বার করে টেবিলে রাখল। ড্রয়ারটা আরো টেনে একদৃষ্টে তাকিয়ে হতাশায় মাথা নাড়ল। মুখ তুলে একবার সে সামনে তাকাল।

গৌরাঙ্গ কৌতূহলী চোখে তাকে লক্ষ্য করছে। প্রিয়ব্রতর মনে হল, ওই দুটো চোখ ক্যামেরার মত তার মনের ছবি তুলে মুহূর্তে ডিভেলাপ করে, প্রিন্ট তুলে ওকে দেখিয়ে দিচ্ছে। দেখে মজা পাচ্ছে। খামটার দিকেও তাকাচ্ছে। ও কি জানে খামের মধ্যে যা রয়েছে সেটা ওর বাবাকে দেখার জন্যই রাখা ! ড্রয়ারটা সে বিরক্ত ভরে জোরে ঠেলে বন্ধ করল। খট্ করে শব্দ হল কাঠের সঙ্গে কাঠের

ধাক্কা লাগায়। প্রিয়ব্রত চমকে মুখ তুলল।

"যেজন্য এসেছি।" গৌরাঙ্গ ঝুঁকে গলা বাড়িয়ে, টেবিলের সঙ্গে মুখ প্রায় ছুঁইয়ে ফিসফিস করে বলল, "বাবার ওটা নিতে এসেছি।"

"কোনটে !" প্রিয়ব্রতর মুখ থেকে শব্দটা বেরিয়ে আসার পরও সাঁই সাঁই আওয়াজ বেরোতে লাগল। হাতুড়ির মত কিছু একটা মস্তিষ্কের কোষে ঘা মেরে তাকে অসাড় করে দিয়েছে।

"বাবার মাসকাবারীটা·····প্রিয়ব্রত নাগ যেটা দিতেন। এবার থেকে ওটা আমিই····।"

প্রিয়ব্রত আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। সারা অফিস ঘর আবছা হয়ে আসছে। ফণী পাল তা হলে মরেনি ! ওর প্রেতাত্মা এখন তার সামনে বসে। অন্ধকার, সব অন্ধকার লাগছে। ওই মশার টুপি পরা সরল হাসিমুখটা, গভীর মনোযোগে ফাইলে তাকিয়ে থাকা মুখটা, অফিসারদের খোপ, টেবল, দরজা, সিঁড়ি ধীরে ধীরে তার চোখ থেকে মুছে যাচ্ছে। ·····লোডশেডিং ! একটা হা-আ-আ রব তার বুকের মধ্যে উঠেই থেমে গেল।

নৈঃশব্দ।

প্রিয়ব্রত হাতড়ে হাতড়ে এগোতে গিয়ে ধাক্কা খেল। মঙ্গলার মুখ, হিতুর মুখ, জ্যাঠাদের বাড়ির সবার মুখ তার পথে ছড়ান।

"নাহ্।"

"ওটা কি এখন আপনার দিতে—"

"কিসের মাসকাবারী ?"

"বাবা যেটা নিতেন !" গৌরাঙ্গর গালের মাংস শক্ত হয়ে উঠল।

"সেটা বাবাই নেবেন, আপনি কে ?"

দ্বিতীয় জগৎ, দ্বিতীয়বার শুরু করা·····ধ্বংস করতে ফণী পাল একে পাঠিয়েছে। নরম হয়ো না, আত্মসমর্পণ করো না। তার বুকের মধ্যে একটা স্বর ভিক্ষা চাইছে। ·····যা পেয়েছ আর হারিও না।

"এখনো রিটায়ার করতে তো আপনার চার পাঁচ বছর বাকি। বাবা বলে গেছেন, ততদিনই আপনি দেবেন। ····তাতে আপনার মঙ্গলই হবে।" গৌরাঙ্গর স্বর এবং মুখ কঠিন হচ্ছে।

"না। আমার মঙ্গল আর চাই না। আপনি আসুন।"

"ভেবে দেখুন। বুঝতে পারছি আপনি শকড হয়েছেন। সময় নিন ভাববার····ব্যস্ত হবার কিছু নেই। আমরা কেউই তো আর মরে যাচ্ছি না বা

পালাচ্ছিও না। আপনাকে অফিস করতে হবে আমাকেও স্কুলে যেতে হবে। অবশ্য একটা ছেলে ছাড়া আপনার আর কেউ নেই আমার সাতটা ছেলেমেয়ে, মা, বৌ রয়েছে। .....তা হলে কবে আসব, কাল ?"

প্রিয়ব্রত মাথা নাড়ল।

"পরশু ?"

"কোনদিনই না।"

"হুট করে না বলবেন না, ভাবুন একটু।" গৌরাঙ্গ যেন অনুনয় করল। পাঁচশো টাকা, বিনা পরিশ্রমে মাসে মাসে পাওয়ার এমন সুযোগ সে হারাতে চায় না।

"বছরে ছ' হাজার, পাঁচ বছরে তিরিশ হাজার। আপনি যদি থোক্ পঁচিশ হাজার দিয়ে দেন তা হলে কথা দিচ্ছি কোনদিনই আর আমার মুখ দেখতে পাবেন না।"

স্বদেশ এল।

"অতুলদা, সেই চিঠিটা। টাইপ করে দিয়েছি।"

স্বদেশ একবার গৌরাঙ্গর মুখের দিকে তাকিয়ে ভৌমিকের টেবিলে গিয়ে বসল। প্রিয়ব্রত খাম থেকে চিঠিটা বার করে খুলে ধরল।...ভৌমিক আর স্বদেশ মাথা নিচু করে ফিসফিসিয়ে কথা বলছে। কি বলতে পারে ? গৌরাঙ্গর কথাগুলো কি ওই টেবিল পর্যন্ত পৌঁছেছে ? ভৌমিকের কান খুব তীক্ষ্ণ, চোখও। অফিসারদের নোটে পটপট বানান ভুল ধরে ফেলে।

ওরা দুজন উঠে ঘরের বাইরে যাচ্ছে। কেন ? এই সময় টেবল ছেড়ে বাইরে যাওয়ার মত কি দরকার পড়ল ভৌমিকের ? প্রিয়ব্রত ঘড়ি দেখল। ছুটি হতে আর পনেরো মিনিট বাকি।

"আমি আর কিছু বলব না। আপনি আসুন।...প্রায় এক লাখ টাকা আমি আপনার বাবাকে দিয়েছি।"

"আর তো মোটে কয়েকটা বছর, মেরে তো এনেছেন!"

গৌরাঙ্গর আবার সরল মুখ। ও কি বুঝতে পেরেছে আমি ভয় পেয়েছি। ওকে "না" বলে দিলে কি হুমকি দিয়ে গলা চড়াবে ? ভৌমিক নেই কিন্তু অন্য কেউ শুনে ফেলতে পারে।

সে মুখ ফিরিয়ে বারান্দার দরজার দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটার মুখের দিকে তাকাতে ভয় করছে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মাস্টারি করে সংসার চালাচ্ছে, ঘরেও অত্যন্ত অসুখী। পাঁচশো টাকা কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেবে

না। ও দিনের পর দিন আসবে, সামনে বসে থাকবে, নীচু গলায় বলবে, 'কিছু কি ঠিক করলেন ?' উঠে যাবার সময় আবার বলবে 'তাহলে কাল— ।' কিন্তু ওরও তো ধৈর্যের সীমা আছে !

একদিন ডিরেক্টরের খাস পিওন সুখেন্দু এসে বলবে, 'সাহেব আপনাকে ডাকছেন।' সে জানে ডাকটা কি জন্য। হাতের ফাইল বন্ধ করে, ড্রয়ারে চাবি দিয়ে সে চেয়ারটা নিঃশব্দে ঠেলে উঠে দাঁড়াবে। আড়চোখে ভৌমিকের দিকে অবশ্যই একবার তাকাবে। নিশ্চয় ও তখন মুখ নামিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকবে। পরে সুখেন্দুর কাছে জেনে নেবে সাহেব কেন অতুলবাবুকে ডেকেছিল ? ডিরেক্টর কাউকে ডেকে পাঠালে সুখেন্দু তখন নানা ছুতোয় ঘরে থেকে যায়। সব শোনে আর অফিসে ফিসফাস তারপরই শুরু হয়।

দোতলায় ডিরেক্টরের ঘরে ঢোকার আগে সে মোটা পাপোষটায় নিশ্চয় জুতো ঘষবে। ছাব্বিশ বছরে সে কতবার এই ঘরে ঢুকেছে ? সাতজন ডিরেক্টর সে দেখেছে। প্রথম তিন-চারটে বছর তো এইঘরের ডাক পাওয়ার মতো যোগ্যতাই তার ছিল না। একটা টেবিলে সে আর অমল চাটুজ্যে মুখোমুখি বসত।

বারান্দার দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে সামনে তাকিয়ে প্রিয়ব্রত দেখল, গৌরাঙ্গ চলে যাচ্ছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ির মাথায় পৌঁছে একবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল। ওর চাহনিতে অবসাদের ভাব। হয়তো চোখের ঝোলান পাতার জন্যও হতে পারে। চেয়ার থেকে উঠে সে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে, একতলায় ল্যাণ্ডিং পেরিয়ে গেটের দিকে যাবার সিমেণ্ট বাঁধান পথটায় পৌঁছতে কতটা সময় লাগার কথা ? প্রিয়ব্রত বাবান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে গৌরাঙ্গকে দেখতে পেল না। তাহলে সিঁড়িতেই বোধহয় ভৌমিক ওকে ধরেছে।

'শুনুন। আপনার বাবা মাসের পয়লা তারিখে টাকা নিতে আসতেন অতুল ঘোষের কাছে। এবার উনি—'

'মারা গেছেন, ক্যানসারে।'

'কিছু মনে করবেন না, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?'

'করুন।'

'আপনার বাবাকে উনি কেন টাকা দিতেন ?'

'বাবা ওর কাছে টাকা পেতেন।'

'অতুলদা বলেছিলেন, খুব অভাব আপনার বাবার, সংসার চালাতে পারেন না, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে—'

'মিথ্যেকথা। অভাব কোন সংসারে নেই ? কিন্তু তা বলে সংসার চলত না, এটা মিথ্যে কথা। উনি একথা বলে থাকলে মিথ্যা বলেছেন। আসলে ওনার আগাগোড়াই মিথ্যা, ভাণ...জীবনটাই ভণ্ডামির উপর দাঁড়িয়ে। ওকে দেখছেন, ওর সম্পর্কে যা জেনেছেন আসলে—'

'আপনার কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছি না! অতুলদা আসলে তাহলে কি ?'

গৌরাঙ্গ কি বলে দেবে, অতুলচন্দ্র ঘোষ আসলে কে ? বোধহয় বলবে না। বলে দিলেই মাসে মাসে পাঁচশো বা থোক্ পঁচিশ হাজার আর পাওয়ার আশা থাকবে না। গৌরাঙ্গ এমন বোকামি নিশ্চয় করবে না। পাবে না, এটা নিশ্চিত ভাবে জানার জন্য ও অপেক্ষা করবে। প্রতিদিন আসবে, এই টেবিলের ওধারে বসে অনুনয় করবে, হুমকি দেবে—সবই চাপা গলায়, সরল মুখে।

কিন্তু ওরও তো ধৈর্যের সীমা আছে!

মোটরবাইকের শব্দটার জন্য সে অপেক্ষা করছে। না শোনা পর্যন্ত তার ঘুম আসবে না। কটা বাজে এখন ? জ্যাঠাদের বাড়িতে একটা জাপানী ওয়াল ক্লক ছিল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাজত। এই ঘর থেকেও শোনা যেত রাত্রে। বছর দুই হল আর সে শুনতে পাচ্ছে না। তার থেকেও ঘড়িটার বয়স বেশি, জ্ঞান হওয়ার পরই তো সে ওটা দেখেছে। আট টাকায় জ্যাঠামশাই নীলামে কিনেছিলেন। কেনার পর একবারও অয়েল করতে হয়নি, একবারও শ্লো বা ফাস্ট হয়নি! একইভাবে চলেছে, বছরের পর বছর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড...এভাবে কোন মানুষের পক্ষে চলা যায় না।

এক ভাবে, একই ভাবে...একটা মিনিটও, একটা সেকেণ্ডও এধার ওধার হবে না, যে দেখবে যে শুনবে অবাক হয়ে যাবে...'কি দারুণ ঘড়ি! কি অদ্ভুত ঘড়ি!'...কই, কেউ তো একবারও বলল না 'ছাব্বিশটা বছর একভাবে, ভয়ের মধ্যে কাটাল! এখনো লোকটা পাগল হয়নি...কি অদ্ভুত!'

চণ্ডীগড়ের প্রোফেসার গুপ্তাও কি এইরকম ভাবছে ? লোকটার সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞেস করত, 'এ ভাবে মানসম্মান সংগ্রহ করে শেষপর্যন্ত কি জুটল ?' গৌরাঙ্গকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, 'এভাবে ব্ল্যাকমেইল করে কি আপনি নিজেকেই অপমান করছেন না ? আপনারও তো আত্মা আছে।'

লোকটা স্কুলমাস্টার, কিছুটা লেখাপড়া করেছে, পাঠ্যবই ঘাঁটে। তাতে অনেক ভাল, গভীর, মহৎ কথা আছে, সেগুলো ছাত্রদের বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করে দিতে হয়। আমার কথাটা নিয়ে হয়তো ভাববার ইচ্ছা হলেও হতে পারে। ভাবতে ভাবতে

হয়তো এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেল যখন ওর মনে হবে—আর না, লোকটা তো যথেষ্ট শাস্তিই পেয়েছে। এবার ওকে ক্ষমা করে দেওয়া যাক। চাকরির জীবন তো প্রায় মেরেই এনেছে, এবার লোকটা স্বস্তি পাক।

কলিং বেল বেজে উঠল।

হিতু এল কি ? মোটরবাইকের শব্দ তো কই পেলাম না ! প্রিয়ব্রত উৎকণ্ঠায় টান টান হল। তিলুর পায়ের শব্দটা নীচে নামছে না। ঘুমিয়ে পড়ল কি ? রাত কটা এখন ?

আবার কলিং বেল বাজল। পরপর তিনবার। যে বাজাচ্ছে সে জানিয়ে দিচ্ছে, খুবই ব্যস্ত। বিছানায় উঠে বসল প্রিয়ব্রত।

এবার কড়া নাড়ার শব্দ। অধৈর্যতা এবার বিরক্তির জানান দিল। প্রিয়ব্রত খাট থেকে নেমে ছুটে গেল ছাদের পাঁচিলে। জ্যাঠামশাইদের বারান্দার আলো জ্বলছে। বোধহয় এইমাত্র জ্বালান হল। পাঁচিলে ঝুঁকে সে দেখল হিতু দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে আর একজন। কিছু কি হয়েছে নাকি !

"যাই-ই-ই।

প্রিয়ব্রত দ্রুত নেমে এল। সিঁড়িগুলো মুখস্ত। মোট তেত্রিশটা সিঁড়ি, তিনটে বাঁক নিলেই একতলা। আলো জ্বালার প্রয়োজনই তার নেই। এখন এটা তার মনেও পড়ল না। হিতুর সঙ্গে আবার লোক কেন ? অ্যাকসিডেন্ট করেছে কি ! মোটরবাইকের শব্দটা সে পায়নি।

বাইরে থেকে লাথি মারার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সে দরজা খুলল। কোমরে দুহাত রেখে হিতু দাঁড়িয়ে। বারান্দার আলোটা পিছনে থাকায় ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। গোড়া কেটে ফেলা গাছের গুঁড়ি দাঁড় করিয়ে রাখার মত সঙ্গের লোকটি দু'হাতে ওর কাঁধ ধরে রয়েছে।

"দরজা খুলেছে, এবার ভেতরে যা ওকে আপনি একটু ধরে নিয়ে যান।" লোকটি নীচু গলায় ব্যস্তভাবে বলল।

প্রিয়ব্রত একে কখনো আগে দেখেনি।

"দরজা খুলতে এত দেরী হল কেন রাসকেল ?"

হিতু সামনে ঝুঁকে পড়ে যাচ্ছিল। লোকটি কাঁধ ধরে সোজা করে দিল।

"কি হয়েছে ?" প্রিয়ব্রত বিভ্রান্ত গলায় জানতে চাইল। তার সারাদেহ থরথর কাঁপছে।

"কিছু হয়নি, একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে···নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিন, সকালে ঠিক হয়ে যাবে। আমি চলি, ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে।"

"ওর মোটরবাইকটা ?" প্রায় আর্তনাদ করে উঠল প্রিয়ব্রত।

লোকটি তিনচার পা এগিয়ে গিয়েছিল। থমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "অফিসের সামনে রাস্তায় রাখা আছে। লোকজন রয়েছে, চুরি যাবে না।"

প্রিয়ব্রত দেখল জ্যাঠামশাইয়ের বারান্দায় ঘোমটা দেওয়া কে এসে দাঁড়াল আর আলোটাও নিবে গেল। অন্ধকার গলি দিয়ে গুপী বসাক লেনের আলোটা ব্যাটারি ফুরিয়ে আসা টর্চের মতো দেখাচ্ছে।

"চল্।"

"কোথায়, কেন, কি জন্য ?...আগে জবাব দে, দরজা খুলতে এত দেরি করলি কেন ? টাকা দেখাচ্ছিস ?...স্কচ ?...শালা, লিখতে পারি, খাটতে পারি, চাকরি আমাকে তাড়া করবে। ইংরিজিটা আমি শিখেছি।...তোর মত গরু নই।"

ঝটকা দিয়ে হিতু হাতটা সরিয়ে দুলতে লাগল।

"হিতু ওপরে চল্।"

"চোপ শালা, আমি কি ডিজঅনেস্ট জার্নালিস্ট যে মদ খাইয়ে আমাকে হাত করবি ? প্রেস কনফারেন্স ! মুতে দি তোর কনফারেন্সের মুখে...তোর মত চোর, স্মাগলারদের বক্তব্য আমি এই হাত দিয়ে টাইপ করব ভেবেছিস ?...বল শালা কেন দরজা খুলতে দেরি করেছিস ? না বললে লাথি মেরে ফাটাব তোর—"

"হি-ও-উ-উ—" দাঁতে দাঁত চেপে প্রিয়ব্রত চাপা চীৎকার করেই দুহাতে জামার কলার ধরে গায়ের সবটুকু জোর দিয়ে হ্যাঁচকা টানে ওকে বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। সদর দরজার পাল্লাদুটো বন্ধ করার শব্দে জ্যাঠামশাইদের অন্ধকার দোতলা থেকে কে বিরক্তি প্রকাশ করল।

অন্ধকার জায়গাটায় হিতু যে কোথায় দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারছে না। তার মাথার মধ্যে কিরকম একটা ওলটপালট ঘটছে। জোরে টানটা দিয়েছে। হিতু হুমড়ি দিয়ে ঢুকে এল ভিতরে, কিন্তু কোথায় ? সে দুহাত বাড়িয়ে বলল, "হিতু।"

দুটোহাত সে, ডুবন্ত মানুষের কিছু একটা আঁকড়াবার চেষ্টার মত দুধারে নাড়ল অন্ধকার থাবিয়ে। কোথায় ও ?

"হিতু ?"

সন্তর্পণে এক পা এগিয়ে সে আবার দুহাত বাড়াল। অন্ধকার শূন্যতাকে সরিয়ে চাইল, রক্ত, মাংস দিয়ে ভরাট একটা তপ্ত অবয়বকে স্পর্শ করতে।

কি হল ? হিতু কি মিলিয়ে গেল ! ! মাথার মধ্যে এসব কি ঘটছে ? দুঃস্বপ্নেই তো এইরকম পরিস্থিতি দেখা যায়। তাহলে কি হিতুটা মরে গেল ?

প্রিয়ব্রত আলোর সুইচের দিকে যাবার জন্য উঠোনের দিকে এগোতে যাবে তখনই আলো জ্বলে উঠল।

"বাবু, দাদা কি এসেছে?"

প্রিয়ব্রত মাথা নীচু করে দেখল, বুকের কাছে হাঁটু জড়ো করে কাত হয়ে হিতু ঘুমোচ্ছে। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ওঠানামা করছে বাহুটা। ঝুঁকে নিচু হয়ে সে হিতুর কপালে হাত রাখল। শান্ত, কোমল মুখটি গাঢ় ঘুমের ছায়ায় বাচ্চা ছেলের মত লাগছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে জিভ দেখা যাচ্ছে।

"তিলু তুই পায়ের দিকটা ধর, ওকে ওপরে নিয়ে যাই।" প্রিয়ব্রত হাতের চেটোয় লাগা ঘাম বুকে মুছল।

তিনতলায় হিতুকে বিছানায় শুইয়ে সে জুতো মোজা খুলে, ভিজে কাপড়ের মত পড়ে থাকা ওর হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করে তুলে দিল।

"যদি তুই তাড়াতাড়ি নেমে দরজা খুলে দিতিস তাহলে আর চেঁচাত না।"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।"

প্রিয়ব্রত নিজের ঘরে এসে খাটে বসল। শূন্যদৃষ্টিতে ঘরের এধার ওধার তাকাল। সিনেমার পর্দার মত তার মাথার মধ্যে এখন দ্রুত বেগে চলে যাচ্ছে আলো জ্বলা ট্রেনের জানলার সারি। এক একটা ঘটনা, কিছু কথার শব্দ, মন্তব্য, ভঙ্গি, হাসি, রাগ, বায়না জানলাগুলো দিয়ে সে দেখতে পাচ্ছে। একসময় ট্রেনটা শেষ হয়ে গিয়ে পর্দাটা সাদা হয়ে গেল।

প্রিয়ব্রত ভোর রাতে ঘুমিয়ে পড়ল, কিন্তু দু-তিনবার তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। আধা তন্দ্রার মধ্যে সে মনে করার চেষ্টা করছিল ···ট্রেনটা যে লাইন দিয়ে যাচ্ছে তার শেষে আছে একটা ভাঙ্গা ব্রিজ। অথচ বিকট একটা শব্দ হল না, কিন্তু ভেঙ্গে পড়ছে দরজা, জানলা, ছাদ, বেঞ্চ। চাকা ছিটকে যাচ্ছে, লাইন দুমড়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে শুধু একটা মানুষ! বুকে একটা ব্যথা সারাক্ষণ ঘুমের মধ্যে তাকে কষ্ট দিচ্ছিল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই সে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। কেউ যেন সিগারেটের ধোঁয়া আকাশের দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে, এমনভাবে মেঘগুলো কুণ্ডুলি হয়ে রয়েছে। কান পেতে শব্দ শোনার চেষ্টা করল। বাসন নাড়ানাড়ি ছাড়া তিনতলায় এই সময় আর কোন শব্দ হয় না। পাশের বাড়ি থেকে রেডিওয় গান ভেসে আসছে, তারমধ্যেই একটা বাচ্চার তারস্বরে কান্না আরো উঁচু পর্দায় উঠল চটাস চটাস তিনটি শব্দের পর। জানলার কাছাকাছি একটা কাক ডেকে উঠল। অন্যান্য দিনের মতই একটা সকাল।

মুখ ধোবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েই চোখাচোখি হল হিতুর সঙ্গে। খাবার টেবিলে বসে। এক হাতে খবরের কাগজ, পাশে আরো দুটো কাগজ, অন্য হাতে চায়ের কাপ। হিতু চোখ সরিয়ে আবার কাগজে রাখল। সকালে ও বিছানায় আধশোয়া হয়েই চা খায়, আজ কেন ঘরের বাইরে খাচ্ছে ? হিতু কি তাকে কিছু বলার জন্য বসে রয়েছে ? ওর চাউনির মধ্যে একটা ঠাণ্ডা ভাব। সে কি আশা করেছিল লজ্জা মেশানো কুণ্ঠা থাকবে ! হিতু তো অন্যায় করলে বরাবরই সেটা স্বীকার করে ! মুখ ধুয়ে প্রিয়ব্রত টেবিলেই বসল হিতুর মুখোমুখি। একটা কাগজ টেনে নিল।

শ্রীলঙ্কা, আই পি কে এফ, তামিল টাইগার্স··· কোকরাঝোর বম্ব ব্লাস্ট···পাঞ্জাব, ফাইভ পারসনস শট ডেড বাই··· নিউ প্ল্যান টু ফাইট কম্যুনাল এলিমেন্টস··· আফগান ফাইটিং···টু মার্ডারিড, গ্রুপ ক্ল্যাশ,··· টকস ফেইল,··ইয়েট টু রিভাইস পে স্কেল,··· পাওয়ার সাপ্লাই ইমপ্রুভস, ···সেমিনার অন ড্রাগ অ্যাবিউস··· ফুডগ্রেইনস প্রাইস হাইক···।

কাগজটা রেখে সে অন্যটা তুলতে যাচ্ছে তখন হিতু বলল, "একটা কথা বলব।"

প্রিয়ব্রত তাকিয়ে রইল। হিতুর চোখ কাগজের দিকে। লজ্জা পাচ্ছে চোখে চোখ রাখতে। ওর কি মনে আছে কাল কি ভাবে বাড়ি ফিরেছিল ?··· 'লাথি মেরে তোর—', কথাটা সে হিতুকে শেষ করতে দেয়নি। তিনকড়িকে তখন কি তার মনে পড়েছিল !

"তোমার কাছে শোনার পর কাল বিকেলে থানায় ফোন করেছিলাম মেয়েটার খবর জানতে।"

"মেয়েটা ? ···নিরু !"

"হ্যাঁ। ও সি-কে পেয়ে গেলাম। খুদিকেলো সকালে থানায় গিয়ে মেয়ের নিরুদ্দেশ হবার খবরটা দিয়ে আরো একটা কথা বলেছিল। ওর ছেলেবেলার বন্ধু, বাড়ির পেছনেই থাকে, সম্ভবত সে ওর মেয়েকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার ভুজুং দিয়েছে বলে ও সন্দেহ করছে।"

"আমি !"

"তোমার নামই করেছে। বলেছে লোকটার বৌ মরে গেছে অনেকদিন, এখন ওর— ।"

"এখন কি ?" প্রিয়ব্রতর হাতের দশটা আঙুল বেঁকে শক্ত হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে হৃদপিণ্ডটা নেমে যাচ্ছে পায়ের দিকে।

প্রশ্নটা যেন শুনতে পায়নি বা শুনেও বাতিল করল, এমন একটা ভাব নিয়ে হিতু বলল "ও সি-র তখনই কিন্তু মনে হয় মিথ্যে বলছে, তাই উনি চেয়েছিলেন সন্দেহভাজন হিসেবে প্রিয়ব্রত নাগের নাম খুদিকেলো ডাইরিতে লেখাক। কিন্তু ও সেটা করতে রাজি হয়নি। ও সি তখন ওকে চেপে ধরেন, কেন তাহলে এতবড় একটা বদনাম একজন বয়স্ক লোক সম্পর্কে দিতে চাইছেন ? অভিযোগ প্রমাণ করতে পারবেন ?"

"কি বলল খুদিকেলো ?"

"তা আর আমি জিজ্ঞেস করিনি তবে ও সি শুধু এইটুকু বললেন, কেসটা যে চালানো যাবে না সেটা গোড়া থেকেই বুঝে ছিলাম। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি ভীতু। নিজেই মেয়েকে সরিয়ে দিয়ে এখন পালিয়ে গেছে বলে রটাতে চাইছে আর সেটাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য এক বয়স্ক বিপত্নীকের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। এইসব শুনে মাথাটায় এমন এক বিশ্রি অবস্থা তৈরী হয়ে গেল যে—।"

"ও সি কি জানেন প্রিয়ব্রত নাগ তোর বাবা ?"

"জানতেন না, পরে বলেছি। বার দুয়েক ওর নাম আমাদের কাগজে বেরিয়েছে। আমার জন্যই তা হয়েছে এই ওর ধারণা। ...কিন্তু একটা জিনিস বুঝছি না, খুদিকেলো তোমার সম্পর্কে এ রকম কলঙ্ক ছেটাতে চাইল কেন ?"

হিতু বিরক্তি, আর রাগ মেশান বিশ্রি একটা চাহনি নিয়ে তাকিয়ে আছে। প্রিয়ব্রত চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চাইল, ওর মনের মধ্যে কি ধরনের কথা জমা হয়েছে।... অভিযোগ, কেন এত দুর্বল চরিত্র ? কিন্তু হিতু তো জানে, মেয়েমানুষের জন্য লোভ থাকলে বহু বছর আগেই বিয়ে করতে পারতাম। খুদিকেলো কেন কলঙ্ক ছেটাতে চাইছে তার কারণ আমি কি করে বলব ? সেদিন মৌলালিতে বৃষ্টির সময় দোকানের দরজায় দাঁড়িয়ে কিংবা চা-সিঙ্গাড়া খেতে খেতে বা বাসে আসার সময় আমার কথাবার্তা, চাহনি, আচারআচরণ, হাবভাবের মধ্যে এমন কিছু ফুটে উঠেছিল কি যাতে খুদিকেলোর মনে হতে পারে নিরুর প্রতি আমার...।

"তুই বিশ্বাস করিস ?"

হিতুর চোখে যেন ছায়া পড়ল, ভেসে গিয়ে ছায়াটা আবার ফিরে এল ! কি ভাবছে ?

হিতু মাথা নাড়ল। "না।"

তাহলে ? প্রিয়ব্রত ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল। বুকের মধ্যের গুমোটটা

কেটে যাচ্ছে। হালকা লাগছে। চেয়ারের পিঠে ঠেশান দিয়ে সে বুঝতে পারল একটা পাতলা হাসি তার ঠোঁটে ভেসে উঠেছে।

"না, তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।... তোমার পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়। সেইজন্যই তো ভেবে পাচ্ছি না, খুদিকেলো লোকটা তোমার সম্পর্কে এই রকম কথা বলতে চাইল কেন!"

কিছুই সম্ভব নয়...এতই অক্ষম! তাহলে এতগুলো বছর ধরে ওকে যে এতবড়টা করে তুললাম, সেটা কি একটা কিছু করা নয়? তাহলে মদ খেয়ে রাতে বাড়ি ফিরে বাবাকে 'লাথি মেরে ফাটাব' বলাটাই হল পুরুষমানুষী কাজ? যার প্রেস কনফারেনসের মুখে মুতে দিস, সেই চোর স্মাগলারের পয়সায় স্কচ খাবার লোভ সামলাতে না পারাটাই হল বিদ্যের বহর?

"চাইল কেন তাব আমি কি জানি।" টেবিলে কিল বসিয়ে প্রিয়ব্রত চেঁচিয়ে উঠল। হিতু এই প্রথম তার বাবাকে চোখ বিস্ফার করে রেগে উঠতে দেখল। "আমি কি খুদিকেলোর মনের খবর রাখি?"

"শুধু শুধুই বলল?"

"হ্যাঁ শুধুশুধুই। একটা অভাবী লোক, সংসারে দ্বিতীয় কোন রোজগেরে নেই, সদাসর্বদা ভাতের চিন্তা, ...আইবুড়ো পাঁচটা মেয়ে, মেয়েদের লেখাপড়া শেখায়নি, ক্ষয়া চেহারা, বিয়ে দিতে পারবে না,... এইরকম লোকেরাই নীচ হয়, ঈর্ষাকাতর হয়। আমি স্বচ্ছন্দে আছি এটা ও সহ্য করতে পারছে না।"

"তুমি স্বচ্ছন্দে আছ? একটা সক্ষম পুরুষমানুষ বিনা স্ত্রীলোকে স্বচ্ছন্দে আছে?... থাকতে পারে? সম্ভব? বিশ্বাস করতে হবে?"

"হিতু এইভাবে কোন ছেলে বাবার সঙ্গে কথা বলে না;"

"সরি।" হিতু কাগজটা চোখের সামনে তুলে ধরল। ঠোঁটের কোণ মোচড়ান। চোখে অশান্তি।

"আগে কিন্তু এইভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতিস না। চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই তুই বদলেছিস।"

"তুমি বলতে চাও যতদিন আমি তোমার হাততোলা হয়েছিলাম ততদিন বাধ্য থেকেছি। আর এখন রোজগার শুরু করে তোমার সমালোচনা করছি?... কিন্তু একটা কথা বুঝছ না কেন, আমারও বয়স বাড়ছে সেইসঙ্গে বিচার ক্ষমতাটাও।"

"তুই আমার বিচার করবি! আমি ভাল কি মন্দ, সেই রায় দিবি?"

"আহ্‌হা, এভাবে কেন কথাটা নিচ্ছ? প্রত্যেক মানুষই অন্য মানুষকে খতিয়ে দেখে অবশ্য যদি তার খতাবার মত মাথা থাকে। খুদিকেলোও তোমাকে

খতিয়েছে আর তার মনে হয়েছে, তুমি ওর মেয়েকে ফোসলানি দিয়েছ বললে লোকে অবিশ্বাস করবে না।"

"মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।"

প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। হিতু কাগজ নামিয়ে কিছু একটা বলতে যাবার আগেই সে বলল, "আমাকে ব্ল্যাকমেল করা যাবে না। অনেক সয়েছি অনেক··· আর আমি নুইব না।"

একটা অন্ধকার হঠাৎ ঝলসে উঠল তার চোখের সামনে। মাথাটা টলে গেল। চোখ বন্ধ করে দুহাত সামনে বাড়িয়ে দুলতে দুলতে, টেবিলের উপর ঝুঁকে কিছু একটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টায় সে নখ দিয়ে সানমাইকা আঁচড়াতে লাগল। হিতু তার মুখ লক্ষ্য করছিল। কপালে বিনবিনে ঘাম, মুখ ছাই রঙা, চোখ দুটো বসা। চমকে উঠে সে প্রিয়ব্রতর হাত ধরল।

"বোসো। বোসো বলছি।" নরম গলায় ধমক দিল হিতু। "খাটে কিছুক্ষণ শুয়ে থাক গিয়ে, মনে হচ্ছে তোমার প্রেসার উঠেছে, একবার ডাক্তার দেখান দরকার। ঘরে চলো।"

"কিছু হয়নি আমার···হাত ছাড়।"

প্রিয়ব্রত চেয়ারে বসে মুখ ফিরিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল ; তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কপালে ভাঁজ পড়ল হিতুর। কাগজটা তুলে আবার সে টেবিলে ফেলে দিল।

"তিলু, ভাল করে একটু চা কর। বাবা খাবে।"

"না।"

"যা বললাম তাই করো, একটু শুয়ে থাকো। তোমার একটা চেক্আপ করান দরকার।"

"দরকার নেই, ঠিক আছি। তিলু, থলিটা দে।"

"যেতে হবে না বাজার।"

"কেন, কি এমন হল যে বাজার যাওয়া যাবে না ?"

প্রিয়ব্রত উঠে ঘরে চলে গেল। লুঙ্গির উপর পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখল হিতু থলি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"আজ আমি বাজার যাব।"

প্রিয়ব্রত বারণ করল না, নিজে বাজার যাবে বলে জেদাজেদিতেও গেল না ; নিজের ঘরে ফিরে এসে করার মত কিছু একটা খুঁজতে লাগল। ব্যস্ত থাকতে হবে, নয়তো তার অস্থিরতাকে বাগ মানাতে পারবে না। খাটের নীচে ফুলঝাড়ুটা

দেখে উবু হয়ে সেটা তুলে নিয়ে সে ঝাঁট দিতে শুরু করল।

খুদিকেলোর সঙ্গে দেখা করে একটা বোঝাপড়া দরকার। তার সম্পর্কে বিশ্রি একটা সন্দেহের কথা পুলিসকে সে কেন বলল, এটা জানতে হবে। হিতু বিশ্বাস করেনি, ও সি বিশ্বাস করেনি, কিন্তু বহুলোক আছে যারা বিশ্বাস করবে। জ্যাঠামশাইদের বাড়ির সবাই, ভৌমিক, স্বদেশ...মঙ্গলা বেঁচে থাকলে এই ধরনের কথা উঠতই না।

প্রিয়ব্রত ছবিটার দিকে তাকাল। বিয়ের দিন পনেরো পর ছবির দোকানে গিয়ে তোলা। সে চেয়ারে বসে, পাশে দাঁড়িয়ে মঙ্গলা। ওর একটা হাত ছিল তার কাঁধে। হাতে ছিল মোটা বালা আর কয়েকগাছা চুড়ি। আঙুলে আংটি। ওই ছবিটা থেকেই মুখটা আলাদা বার করে বড় করিয়ে নেওয়া। সিঁথেয় সিঁদুর আর কপালের টিপটা রঙ করান।

ফোটোগ্রাফার বলেছিল, এইদিকে তাকান, হাসুন...হাসুন। দুটো জোরালো আলো জ্বলছিল। একটা পাশ থেকে আর একটা সামনে নিচু থেকে। আলোর তাতে মঙ্গলার মুখে ঘাম ফুটেছিল। তারা দুজনেই তখন হেসেছিল, জোর করেই হাসা। কিন্তু এখন মঙ্গলার মুখে সেটা মিষ্টি দেখাচ্ছে। ওর মুখের নীচের দিকটা হিতু পেয়েছে, কিন্তু আর কিছু কি?

রাতে তৈরী রুটি সে সকালে খেত, হিতুর জন্য পাঁউরুটি। ভোরবেলায় দুধ আনার সময় কিনে আনত। সে নিজের হাতে সেঁকে জেলি মাখিয়ে দিত। হিতু বছর খানেক পর জানতে পারল তার বাবা রাতের বাসি রুটি খায় গুড় দিয়ে। জেনে ও খুব অবাক হয়ে গেছিল এইজন্যই যে, বাবা কিভাবে এটা তার কাছে লুকোতে পেরেছে এতদিন!

'খুবই সহজ, তুই যদি আমার আগে ঘুম থেকে উঠতিস তাহলেই দেখে ফেলতিস।' পরের দিনই ঘুম ভেঙ্গে সে হিতুকে পাশে দেখতে পায়নি। ঘর থেকে বেরিয়েই দেখে টেবিলে বসে হিতু রুটি চিবোচ্ছে।

"এবার থেকে আমি রুটিই খাব।'

তখন ওর বয়স বারো। হাজার অনুরোধেও ওইটুকু ছেলেকে সে জেদ থেকে টলাতে পারেনি। এতে কি গভীর সুখ যে সে পেয়েছিল! মঙ্গলাও সুখী হত। বেঁচে থাকলে দেখে যেতে পারত, দিনে দিনে তারপর সেই হিতু বড় হল। টিভি আনল, ফ্রিজ আনল, মোটরবাইক চড়ছে। বিদ্যেবুদ্ধি বেড়েছে।...কিন্তু ফণী পালের কথা কখনো জানতে পারেনি। এই একটা ব্যাপার সে ছেলের কাছে আজও লুকিয়ে রাখতে পেরেছে।

'তোমার পক্ষে কিছুই সম্ভব নয়।'

যদি অসম্ভবই হবে তাহলে পারলাম কি করে ? তোর জন্মেরও আগে ফণী পাল এসেছে এই সংসারে। একটা ভয়ের ছাতা সে ধরে রেখেছিল এই সংসারের মাথার উপর। তার ছায়ায় জীবনের সেরা সময়টা সে কাটিয়েছে। ফণী পাল মরে গেছে শুনে ভেবেছিল ছাতাটা এবার বন্ধ হল। কিন্তু ছাতাটা সে তুলে দিয়ে গেছে গৌরাঙ্গর হাতে।

প্রিয়ব্রত ঝাঁট দেওয়া ধুলো কাগজে তুলে সেটা পগাড়ে ফেলার জন্য ছাদে গেল। পাঁচিলের কাছে পৌঁছেই নীচের ছাদে তার চোখ পড়ল। খুদিকেলোর বৌ তারে কাপড় মেলছে। শীর্ণদেহে আবরণ শুধু এলোমেলো ভাবে পরা জ্যালজেলে ছাপা শাড়ি। কোন অন্তর্বাস নেই। মুখ ও হাতদুটি তোলা। তাকে দেখতে পায়নি কিন্তু ওর শাড়ি ভেদ করে গোটা শরীরটা সে যেন দেখতে পাচ্ছে। সত্যিই পাচ্ছে, না একটা ইচ্ছা তাব মনে এইমাত্র প্রসব করল!

একেবারে নিরু! মাথার চুল, কপাল, নাক, থুতনি, কান, ঘাড়, গলা, কাঁধ, পিঠ, কোমরের ভাঁজ··· প্রিয়ব্রত পাঁচিল থেকে পিছিয়ে এল। খুদিকেলোর বৌ এইবার এদিকে ঘুরেছে। সে পিছনে তাকিয়ে দেখল, তিলু কোথায়!

আগেও তো সে নিরুর মাকে দেখেছে, কিন্তু এই ভাবে নয়। মানুষের মিল মুখের মধ্যেই খোঁজা হয় কিন্তু সে শরীরের মধ্যে খুঁজল কেন ? ···তাহলে নিরুকেই কি সে খুঁজছে!···হিতু কি এই খোঁজার কথাই বলতে চেয়েছে ? ও কি আমার ভেতরটা দেখতে পায়!

প্রিয়ব্রত স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। আবার একটা ভয় তাকে গিলতে আসছে।

॥ ছয় ॥

ঘড়ির দিকে সে তাকাল। ভৌমিকের চেয়ারটা খালি। এইমাত্র নেমে গেল দোতলায়। চারদফা দাবী আর দুজন ব্লক সার্ভেয়ারের সাসপেনসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানান হবে অফিসের গেটে। এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সক্রিয় সদস্য ভৌমিক সেজন্য ব্যস্ত। প্রিয়ব্রতও সদস্য কিন্তু সে বিক্ষোভ, অবস্থান বা মিছিলে থাকে না। এ জন্য ভৌমিক এবং আরো অনেকের টিপ্পনি সে শুনেছে। তর্কাতর্কির মধ্যে না গিয়ে সে শুধু হেসে মাথা নাড়ে।

'আমার থাকা আর না থাকা একই কথা। সত্যিকথা বলতে কি ভৌমিক, চীৎকার, চেঁচামিচি, ঘুঁষি পাকানো আর গালাগাল আমার ভাল লাগে না! পঁচিশ

বছর ধরে যা দেখে আসছি আজও তাই চলছে, কিছুই বদলাল না।'

'ঠিকই বলেছেন অতুলদা, কিছু বদলায়নি শুধু ধাপে ধাপে চড়ছে প্রাইস ইনডেক্স। ওটার সঙ্গে পাল্লা দিতেই আমরা গলা চড়াচ্ছি। আপনার আর কি দুটো মাত্র লোক! ছেলেও চাকরি করছে, কোন সমস্যাই নেই।'

ভৌমিক তার সমস্যার কতটুকু জানে? ও কি প্রিয়ব্রত নাগকে জানে? কাল কি গৌরাঙ্গকে সিঁড়িতে ধরার জন্যই স্বদেশকে নিয়ে উঠে গেল? ফণী পাল, খুদিকেলো, গৌরাঙ্গ, হিতু, নিরুকে কি জানে? ওর কাছে সমস্যা বলতে শুধু সংসারে অন্ন যোগাবার মানুষের সংখ্যা নিয়ে। 'জানলেন অতুলদা, আমার খুব মেয়ের সখ তাই বৌকে বলেছিলুম সেকেন্ড ইস্যু যদি মেয়ে হয় তাহলে অপারেশন করে নোব। কি লাক্ দেখুন ঠিক মেয়েই হল।'

আবার সে ঘড়ির দিকে তাকাল, ঠিক এই সময়টাতেই ফণী পাল আসত, গৌরাঙ্গও কাল এসেছে। বোধ হয় এটাও ফণী পাল ছেলেকে বলে দিয়ে গেছে, কখন যেতে হবে। আজ হয়তো আসতে পারে। আজ না কাল না পরশু কবে যেন আসবে বলে গেছিল। সে আর একবাব মনে করার চেষ্টা করল। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে লোকটা বলে গেল অথচ মনে পড়ছে না। স্মৃতি শক্তিটা কমে আসছে।

"অতুলদা এখনো বসে যে? যাবেন না?"

স্বদেশ। ওর চিঠিটা হিতুকে দেওয়া হয়নি। বোধ হয় চিঠির কথাই জানতে এসেছে।

"কোথায়? গেটে? না, জানই তো আমি কখনো এসবে থাকি না।"

"থাকাটা দরকার।" স্বদেশ টেবিলের উপর ঝুঁকে হঠাৎ গলার স্বর নামাল। "অফিসে কখন যে কিসে ফেঁসে যাবেন আপনি তা জানেন না।... একটা মেমো যদি ধরিয়ে দেয়, তখন আপনি একা লড়ে সেটা উইথড্র করাতে পারবেন? বলুন, পারবেন? যে দুজন সাসপেন্ড হয়েছে, জানি তাদের দোষ আছে, কিন্তু আমরা অর্ডারি উইথড্র করাবই... ওরা আমাদের অ্যাকটিভ মেম্বার।"

'ফেঁসে যাবেন' বলল কেন? প্রিয়ব্রতর ভ্রু আপনা থেকেই কুঁচকে উঠল। তাহলে গৌরাঙ্গর সঙ্গে ওরা দুজন কি কাল কথা বলেছে? কিন্তু লোকটাকে তো ধূর্ত বলেই মনে হল। হাতের তাস দেখাবার মত বোকা নয়।

"তোমার চিঠিটা ছেলেকে দিয়েছি। গুছিয়ে চমৎকার ইংরিজিতে লেখা।"

স্বদেশের মুখচোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। "কাল অফিসে বসেই লিখে, টাইপ করিয়ে নিলুম। একটু ভেবে চিন্তে লিখলে—"

"না না, বেশি ভাবলে লেখা আড়ষ্ট হয়ে যায়। দ্যাখোনা, যেসব মানুষ খুব ভাবে তারা নিজেদের এক্সপ্রেস করতে পারে না।"

"যেমন আপনি। আপনাকে প্রথম থেকেই দেখছি, কি যেন একটা চিন্তায় ডুবে আছেন, কম কথা বলেন। দেখলেই মনে হয় ভীষণ জটিল একটা দার্শনিক সমস্যা নিয়ে অবিরত ভেবে চলেছেন!"

"আমাকে দার্শনিক দেখায় নাকি? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে হবে তো!"

"বুঝতে পারবেন না। নিজেকে নিজে বোঝা খুব শক্ত। আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আপনি সচেতন হয়ে পড়বেন আর তখন অন্য একটা লোককে দেখবেন।...আসলে অতুলদা, একটা মানুষের মধ্যে সব সময় দুটো লোক থাকে, ডাক্তার জেকিল আর মিস্টার হাইড। এই জন্যই আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল পর্যন্ত আঁচড়াই না। কি জানি বাবা, নিজের কি চেহারা দেখে ফেলব?"

স্বদেশ পকেট থেকে চিরুণী বার করে চোখের সামনে তুলে, ময়লা রয়েছে কি না দেখতে লাগল। প্রিয়ব্রত পাংশু মুখে তাকিয়ে। জেকিল আর হাইড মানে প্রিয়ব্রত আর অতুল, এটাই তো বলতে চায়! তাহলে এরা জেনে ফেলেছে।

দরজার কাছ থেকে একজন "স্বদেশ" বলে চেঁচিয়ে উঠল। তারদিকে হাত তুলল স্বদেশ অপেক্ষার ইঙ্গিত জানিয়ে।

"চলি অতুলদা...যা বললুম, আন্দোলনে বিক্ষোভে থাকার চেষ্টা করুন। চিঠিটা কি তাড়াতাড়ি বের করা সম্ভব? মশার উৎপাত থাকতে থাকতে বেরোলেই ভাল হয়। যাই হোক দাদা, আমার হয়ে ছেলেকে তাগাদা দেওয়ার ভারটা আপনার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।" কথা বলতে বলতেই চিরুণীটা চুলে বসিয়ে স্বদেশ দরজার দিকে এগোল। প্রিয়ব্রত ওর চুল আঁচড়ান দেখতে লাগল। ওর নাকি আয়নার দরকার হয় না!

আন্দোলনে বিক্ষোভে থাকতে হবে! দল বেঁধে চীৎকার করলে গৌরাঙ্গ কি উইথড্র করবে কিংবা খুদিকেলো? আমিও তো এই পৃথিবীতে, সংসারের একজন অ্যাকটিভ মেম্বারই।... যেদিন ফণী পালকে পাঁচ হাজার টাকা দিলাম সেদিন আমি নিজেই তো মেমো দিয়েছি নিজেকে!—'জানি তাদের দোষ আছে কিন্তু আমরা অর্ডার...' আমরা? কিন্তু আমি তো একা!

প্রিয়ব্রত ঘড়ি দেখল, গৌরাঙ্গ আজ আর তাহলে আসছে না। ড্রয়ার বন্ধ করার জন্য সে মুখ ফিরিয়ে নীচে তাকাল। সাদা খামটা ওপরেই রয়েছে। ড্রয়ার ঠেলে চাবি ঘোরাল। গেটের কাছে নিশ্চয় এতক্ষণে ভীড় জমে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময়ই স্লোগান শুনতে পেল। গেটের দিকে এগোবার সময় আপনা থেকেই তার মাথাটা ঝুঁকে পড়ল। সিমেন্ট বাঁধান পথের দিকে তাকিয়ে চলতে চলতে সে একটা লিচুর বিচি দেখে থমকে দাঁড়াল। এর উপর জুতো পড়লে হড়কে পড়ার সম্ভাবনা আছে। বিচিটাকে পা দিয়ে পাশে সরিয়ে দেবার সময় তার ফণী পালকে মনে পড়ল। লাঠিটা দিয়ে নিশ্চয় সে এই কাজই করত। লোকটা ক্যানসারের যন্ত্রণা পেয়েছে অথচ কাউকে তাই নিয়ে বিব্রত করেনি। কিছু গুণ অবশ্যই ছিল।

"কি অতুলবাবু, চললেন নাকি?"

"হ্যাঁ ভাই।"

"উনি এসব দাবীদাওয়ার ব্যাপারে থাকেন না।"

থাকি না কেন? কোন দাবীই কি আমার নেই? প্রিয়ব্রত একবার আকাশে তাকাল। মেঘ নেই। কালবৈশাখি আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। বৃষ্টি পড়বে না, কোন দোকানের দরজায় উঠে দাঁড়াতে হবে না। হঠাৎ দেখা হওয়া ছোটবেলার কোন বন্ধুর সঙ্গে নতুন করে আলাপের সম্ভাবনা দেখলেই সে এড়িয়ে যাবে।

কোন দাবীদাওয়াই কি নেই? হিতু হলে কি বলত? বাবা জীবনটাকে চুমুক দিয়ে খাওয়ার দাবী জানায়নি বলে ছেলে তাকে মানুষ হিসেবে তুচ্ছ মনে করে! যারা গেটে স্লোগান দিচ্ছে তারাও হয়তো তাকে মেরুদণ্ডহীন, সুবিধাভোগী ভাবে,...এমন কি নিরুও হয়ত! সেদিন ওর চোখে এই কথাটাই বোধহয় ছিল—এই জন্যই আমি খুন হব।

যদি সে নিরুকে বলতে পারত, আমার একতলার ঘরেই লুকিয়ে থাক ক'টা দিন! মামলাটা কেঁচে না যাওয়া পর্যন্ত গুণ্ডাদের হাত থেকে আমি তোমাকে লুকিয়ে রাখব। তাহলে ওর চোখে কি ভাষা ফুটে উঠত?

খুদিকেলো তারপরও কি থানায় গিয়ে বলত, এই লোকটার বৌ মরে গেছে, তাই আমার রেপড হওয়া মেয়েকে ফুসলিয়ে বাড়িতে নিয়ে তুলেছে?...থানার ওসি ঠিকই বুঝেছে, 'লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি ভীতু।' হতে পারে, খুদিকেলো নিজেই নিরুকে কোথাও সরিয়ে দিয়েছে। মেয়ে বেঁচে থাকলে কাজকর্ম করে কিছু টাকা সংসারে এনে দিতে পারবে। নিরুকে ও বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

কিন্তু তাই বলে এত বড় একটা অপবাদ তার নামে কেন দেবে? ভৌমিকের মতো খুদিকেলোও 'দুটো তো মাত্র লোক... কোন সমস্যাই নেই' ভেবে নিয়ে ঈর্ষার জ্বালায় কি এই ধূর্তোমিটা করল? অভাব আর পাঁচটা মেয়ে নিয়ে

খুদিকেলো ব্যতিব্যস্ত থাকতে পারে, কিন্তু সেজন্য এতটা নীচে নামবে ?

সেন্ট্রাল অ্যাভিনু পার হয়ে প্রিয়ব্রত গুপী বসাক লেনে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটা জীপ দাঁড়িয়ে। পুলিসের জীপ ! দিন দশেক আগে দু'দলের বোমার লড়াই হয়েছিল সকালে। অফিস যাবার সময় ওখানেই একটা পুলিসের জীপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। ধুতি-হাফ শার্ট পরা, কাঁচাপাকা চুল, গোল মুখ, লম্বা চওড়া এক জমাদার হাতে লাঠি নিয়ে মিষ্টির দোকানীর সঙ্গে কথা বলছিল, আর জীপের ধারে ইউনিফর্ম পরা এক এস আই দাঁড়িয়েছিল। জীপের পিছনে রাইফেল নিয়ে বসেছিল একজন। আবার কি বোমাবাজি হয়েছে ! কৌতূহলী হয়ে প্রিয়ব্রত এগোল।

রাস্তাটা চওড়া থেকে সরু হয়েছে যেখানে, জীপটা সেখানেই দাঁড়িয়ে। তিনটি ছেলে একটু দূরে শিথিল ভঙ্গিতে ডাক্তারবাবুর সিঁড়ির ধাপে বসে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ওদের প্রায় সবসময়ই এখানে বসে থাকতে দেখা যায়। বাচ্চারা রাবারের বল খেলছে রাস্তায়। আলুকাবলিওলাও রয়েছে। বাড়ির দেয়াল ঘেঁসে বসা মুচি জুতো সারাইয়ে ব্যস্ত। কয়লার দোকানের সামনে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে। প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে দপদপানি শুরু হল। সবই প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিক তাহলে পুলিশের জীপ কেন ?

"এই যে, এই যে..." সিঁড়িতে একটি ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে জীপের দিকে হাত নাড়ল। ড্রাইভারের পাশের সীট থেকে কাঁচাপাকা চুলের একটা গোলাকার ভরাট মুখ উঁকি দিল। প্রিয়ব্রত চিনল। লাঠি হাতে সেদিনের সেই জমাদার। "কাকাবাবু পুলিশ আপনাকে খুঁজছে।"

কথাটা কানে লাগল প্রিয়ব্রতর। আপনা থেকেই সামনের বারান্দা আর জানলায় তার দৃষ্টি চলে গেল। নীরোদ কাকা দাঁড়িয়ে, পাশে ওর বৌ। পাড়ার সার্বজনীন দুর্গাপুজোয় উনি বহু বছর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। একতলার জানলায়, চুলবাঁধায় ব্যস্ত একটি বৌ উঁকি দিল।

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসু চোখে জিপের দিকে তাকাল। জমাদারটি হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

"আপনিই প্রিয়ব্রত নাগ ? পঁচিশ নম্বর গুপী বসাক লেনে থাকেন ?" কথায় হিন্দি টান কিন্তু পরিষ্কার বাংলায় জমাদার যথাসাধ্য বিনীত হবার চেষ্টা করল।

"হ্যাঁ, আমিই।"

"বড়বাবু আপনাকে থানায় নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছেন, জরুরী দরকার। আপনার বাড়ি ঘুরে এসে এখানে দশ মিনিট হল অপেক্ষা করছি, পেছনে উঠে

পড়ুন।"

...অফিস   কি এত তাড়াতাড়ি অ্যাকশন নেবে ? একটা পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তো যেতে হবে, সেজন্য সময়ও লাগবে ! কী ব্যাপার ? প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে বরফ তৈরী হচ্ছে। গৌরাঙ্গ তাহলে কি আর অপেক্ষা করেনি ?

"গেলেই জানতে পারবেন।"

জীপের পিছনে গিয়ে প্রিয়ব্রত ভিতরে তাকিয়েই নিথর হয়ে গেল। খুদিকেলো বসে রয়েছে। তাকে দেখে জায়গা করে দিতে সে সরে বসল।

মিনিট তিনেক লাগল থানায় পৌঁছতে। তারমধ্যে একটা কথাও বিনিময় হয়নি ওদের মধ্যে। প্রিয়ব্রত সারাক্ষণ মুখ ফিরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। নিজেকে চিন্তার মধ্যে ঠেলে দেবার সাহস তার আর ছিল না। খুদিকেলো মাথা নামিয়ে বিরক্ত স্বরে দু-তিনবার বিড়বিড় করেছে। সে জানে কেন তাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

"ঘরের মধ্যে যান।" দরজায় দাঁড়ান সান্ত্রী চোখের ইশারায় ঘরে ঢুকতে বলল। থানায় এই প্রথম তার আসা। প্রিয়ব্রত দ্বিধা করছিল। খুদিকেলো ঢুকে গেল তাকে পাশ কাটিয়ে।

টেবিলটা আকারে তার ডিরেক্টরের ঘরের টেবিলের মতই। তবে টেবিলের উপর কাঁচটা নেই, কাগজ বা ফাইলেরও ছড়াছড়ি নেই। একটা ফুলদানি, তাতে মরশুমি ফুলও রয়েছে, প্লাস্টিকের নয়। টেবিলের সামনে তিনটি লোক দাঁড়িয়ে, তাদের একজন লুঙ্গি পরা, ঘরে ঢুকেই প্রিয়ব্রত যার ধমক শুনতে পেল, অনুমান করল সেটা বড়বাবুরই।

"...তা পুলিশ কি করবে ? কর্পোরেশন যদি আবর্জনা রাখার জায়গা আপনাদের বাড়ির সামনে করে তাহলে কর্পোরেশনকে গিয়েই বলুন, এখানে এসেছেন কেন ?"

"তাহলে স্যার ওই জঞ্জাল দিয়ে যখন রাস্তা বন্ধ করব তখন কিন্তু পুলিশ-টুলিশ মানব না। এটাই আগাম জানিয়ে গেলাম।"

"সে তখন দেখা যাবে।"

"হ্যাঁ, তখন দেখবেন...চল্ চল্।"

ওরা টেবলের সামনে থেকে সরে যেতেই প্রিয়ব্রত বড়বাবুর মুখ দেখতে পেল। গৌরবর্ণ, চৌকোমুখ। পাশে সিঁথিকাটা চুল। গলা, বুক ও কাঁধের গড়ন জানান দিচ্ছে ব্যায়াম করেন। চোখ দুটি টানা এবং ছোট। দুটি মণি প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

"আমার নাম প্রিয়ব্রত নাগ। আমাকে..."

"ওহ্‌ বসুন বসুন। আপনার ছেলের সঙ্গে ফোনে পরশু কথা বলছিলাম...আপনিও বসুন।"

খুদিকেলো তার পাশের চেয়ারটায় বসল। বড়বাবু দরজার দিকে তাকিয়ে কাকে যেন বললেন, "নিয়ে এস।" তারপর ওদের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে চেয়ারে সোজা হয়ে বসতে বসতে, "পাওয়া গেছে। বৌবাজারেই আজ ধরা পড়েছে।...আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে—"

"কে ধরা পড়েছে?" প্রিয়ব্রত শ্বাসবন্ধ রেখে কথাটা বলে ঝুঁকে পড়ল।

"ওনার মেয়ে, নিরুপমা...এই যে।"

একই সঙ্গে প্রিয়ব্রত আর খুদিকেলো মুখ ঘোরাল। নীরুর পরণে একটা ছাপা খয়েরি রঙের শাড়ি আর ব্লাউজ, অবিন্যস্ত চুল, আঁচলে ঘাড়, গলা ঢেকে রাখা। পায়ে হাওয়াই চটি। সে সোজা হয়ে বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে এগিয়ে এল। বসার চেয়ার আর নেই। ঘরে দেওয়ালের ধারে বেঞ্চটা দেখিয়ে বড়বাবু ইসারা করলেন ওখানে বসার জন্য। নীরু ধীরগতিতে গিয়ে বসল। এমন ভাবে দুটি হাত আড়াআড়ি বুকের ওপর রাখল যেন উপেক্ষা ছাড়া ঘরের লোকগুলোকে তার আর কিছু জানাবার নেই। চোখে ঝাঁঝালো প্রতিরোধ তৈরী হয়ে উঠেছে।

"ধরেই নিয়েছিলাম, যদি কোথাও যায় তো ওই কালপ্রিটদের কাছেই আগে যাবে।...ভয়টা তো ওদেরই...মেয়েছেলে, দুর্বল ভীতু, প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে ওদের কাছে গিয়েই তো নিজেকে সাবমিট করবে। খুব কমন সায়কোলজি।" বড়বাবু হাসলেন। চোখদুটো তাতে প্রায় বুঁজে গেল। "নজর রাখা ছিল। ওদের মধ্যে বাচ্চা নামে একটা ছেলে, ওই কার্ডবোর্ড কারখানাতেই কাজ করে, তার মার সঙ্গে যখন নিরুপমা একটা নার্সিংহোম থেকে বেরোচ্ছে তখনই পুলিশের হাতে পড়ে। নাবালিকা নয়, স্বেচ্ছায় বাড়ি থেকে চলে গেছে, এক্ষেত্রে আমাদের তো কিছু করার নেই।"

বড়বাবু যখন কথা বলছেন, প্রিয়ব্রত আড়ষ্ট হয়ে একদৃষ্টে তখন তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। একবারের জন্যও সে মুখ পাশে ফেরায়নি। কিন্তু তার মনে হচ্ছিল নিরু তাকে লক্ষ্য করছে।

"স্যার আপনি সন্দেহ করেছিলেন আমিই ওকে কোথাও পাচার করেছি।" খুদিকেলো অনুযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের দিকে তাকাল।

"সন্দেহ হয়েছিল যেহেতু আপনি এই ভদ্রলোকের চরিত্রে কলঙ্ক লেপে দিতে চেয়েছিলেন। আর সেইজন্যই ওনাকে ডেকে এনেছি, মেয়ের সামনে আপনি

বলুন কেন ওনার চরিত্র হনন করার মত অপবাদ দিয়েছিলেন ? উনি তো এখন মানহানির মামলা করতে পারেন।"

"বিশ্বাস করুন স্যার, প্রিয় আমার ছোটবেলার বন্ধু, ওর সম্পর্কে কখনোই আমার খারাপ ধারণা ছিল না, আজও নেই। শুধু ওই হারামজাদী মেয়েই আমার মনে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কি বলে ছিল জানেন।" খুদিকেলো মুখ ঘুরিয়ে নীরুর দিকে তাকাল, বড়বাবুও তাকালেন। প্রিয়ব্রত সোজা সামনে তাকিয়ে রইল।

ঘরটা হঠাৎ নৈঃশব্দ্যে ভরে গেল।

"বলেছিল, তোমার ওই বন্ধুটা খুব বিপজ্জনক লোক। আমাকে নিয়ে পালাতে চাইছে।"

"না। মিথ্যেকথা, একদম মিথ্যে।" প্রিয়ব্রত উত্তেজিত হয়ে চীৎকার করে উঠল। বড়বাবু হাত তুলে তাকে শান্ত থাকতে ইসারা করলেন।

"তুমি বাবাকে একথা বলেছ ?"

"হ্যাঁ।"

"উনি কি তোমাকে নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাবার কথা বলেছিলেন ?" গম্ভীর, শান্ত এবং অনিশ্চিত বড়বাবুর স্বর।

ঘরে আবার স্তব্ধতা ফিরে এল। প্রিয়ব্রত মুখ নামিয়ে টেবিলের দিকে তাকিয়ে। তার মনে হচ্ছে মেয়েটা মিথ্যাকথাই বলছে না, আসলে তাকে খুন করছে।

"জবাব দিচ্ছ না কেন ?"

"না, উনি আমাকে নিয়ে পালাবার কথা বলেননি।"

"তাহলে ? তুমি বাবাকে তাহলে বললে কেন— ?"

"আমার মনে হয়েছিল।" ঠাণ্ডা পরিষ্কার স্বরে নীরু ঘরটাকে অপ্রতিভ, বিভ্রান্তিকর অবস্থার মধ্যে ফেলে দিল।

"মনে হয়েছিল মানে ? উনি মুখে তাহলে কিছু বলেননি ?"

"আমার মনে হয়েছিল উনি পালাতে চান। কিন্তু একা পালাবার সাহস নেই, তাই আমাকে সঙ্গে চান। কেন যে মনে হয়েছিল বলতে পারব না।...লোডশেডিং হয়েছিল, অন্ধকার রাস্তায় কয়েকটা লোক এগিয়ে আসছিল। আমি ভয়ে ওকে জড়িয়ে ধরি, উনিও আমাকে জড়িয়ে ধরেন...না না, খারাপ উদ্দেশ্য ওনার ছিল না। কিন্তু আমার তখন মনে হল, কেন যে মনে হল জানি না,...বোধহয় ওর কাছে আশ্রয় চাওয়া যায়। আমি চেয়েছিলাম...বারবার

বলেছিলাম থাকতে দিন আপনার নীচের ঘরে, মামলা কেঁচে না যাওয়া পর্যন্ত থাকতে দিন। উনি দেননি।"

নীরুর গলা কাঁপছে। স্বর বুজে এল ক্ষোভ, লজ্জা আর দুঃখের চাপে। দুচোখে জলে ভরে উঠছে। মুখটা নামিয়েই আবার ঝাঁকুনি দিয়ে তুলে সে কঠিন গলায় বলল, "...উনি ভীতু, উনি কাপুরুষ, উনি...।"

চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে নিজের চেয়ারেই প্রায় হোঁচট খেল। হুমড়ি থেকে সামলে ওঠার সময়, মুহূর্তের জন্য নীরুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, তার মনে হল একশো রকমের কথা ওর চোখে ফুটে রয়েছে কিন্তু একটারও অর্থ তার বোধগম্য হচ্ছে না।

"আমার আর এখানে থাকার কোন দরকার নেই...থাকার মানে হয় না।" ধীর পায়ে সে থানা থেকে বেরিয়ে এল।

বাড়ি ফিরে প্রিয়ব্রত প্রতিদিনের মত মাথা না ভিজিয়ে স্নান করল। ওমলেট আর চা খেয়ে, টিভি দেখার জন্য খাটে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে দিল। চর্মরোগ সম্পর্কে দুজন ডাক্তারের মতামত মন দিয়ে শুনল। ভরতনাট্যম নাচ দেখল। পেঙ্গুইনদের নিয়ে তথ্যচিত্র তার ভাল লাগল। বাংলা গোয়েন্দা সিরিয়ালের পর সে তিলুর সঙ্গে মন্তব্য বিনিময় করল। হিন্দি খবর শুরু হতেই রোজকার মত টিভি বন্ধ করে তিলু খবরের কাগজগুলো তাকে এনে দিল। প্রিয়ব্রত খুঁটিয়ে পড়া শুরু করল।

পড়ার মাঝে একবার সে ভ্রূ কুঁচকে জানলার দিকে আনমনা দৃষ্টিতে তাকায়। তারপর সে আবার কাগজ পড়তে শুরু করে। কিন্তু কি যে পড়ছে তা সে জানে না। তবে নিজেকে সে বহুদিন পর শান্ত বোধ করছে। এতকাল ধরে সে কিছু একটা চাইছিল, সেটা যেন এবার খুঁজে পেয়েছে। কোন রকম ভাবনার মধ্যে নিজেকে আর জড়িয়ে ফেলতে রাজী নয়। সে জেনে গেছে, তার ভণ্ডামি ধরে ফেলার লোক আছে।

পরদিন প্রিয়ব্রত অফিসে পৌঁছল পঁচিশ মিনিট আগে। তাদের ঘরের একজনও তখন আসেনি। শূন্য, নিস্তব্ধ ঘরটা তাকে অবাক করল। অস্বাচ্ছন্দ্যে ফেলল। ছাব্বিশ বছরে এই প্রথম তার অফিসকে প্রাচীনযুগের সংগ্রহে ভরা একটা ঘরের মত লাগছে। ডাঃ গুপ্তার কথা তার একবার মনে পড়ল। পঁচিশ বছর ধরে লোককে ঠকিয়ে গেছেন আজেবাজে ফসিলের উপর গবেষণা-প্রবন্ধ লিখে। অধ্যাপক নাকি মামলা করবে!

প্রিয়ব্রত চেয়ারে চুপ করে বসে, আধা আঁধারি অফিস ঘরের মেঝে, দেওয়াল, পার্টিশান, আলমারি, চেয়ার-টেবিল, র‍্যাকের ধুলোজমা থরেথরে রাখা ফাইলগুলোর উপর চোখ বোলাল। এগুলোও তো ফসিল! কত লোকের জীবনের সেরা সময়গুলো এরমধ্যে পরতে পরতে জমে ছাপ ফেলে রেখেছে। কেউ এসব নিয়ে নাড়াচাড়া করবে না।

"অতুলদা, আজ যে এত শিগ্গিরি!"

ভৌমিক। আরও একটা ফসিল। না, এখনো হয়নি তবে হতে যাচ্ছে। মেয়ের বাবা হয়ে সুখী, প্রাইস ইনডেক্স চড়লে গলা চড়ায় আর বিক্ষোভ জানায়, সংসারে অন্ন যোগাবার সংখ্যা যাদের কম তাদের হিংসে করে।

"এই এসেছিলাম এদিকে একটা কাজে।" প্রিয়ব্রত ড্রয়ার বন্ধ করল। সব চেয়ারেই লোক এসে গেছে। "নীলরতনে এক ডাক্তারের কাছে গেছলুম।"

"নিজের জন্য? কি হয়েছে?" ভৌমিককে সন্ত্রস্ত দেখাল। ওর আঠাশ বছরের ওয়েটলিফটার ভাই ক্যানসারে মারা গেছে। ডাক্তার, হাসপাতাল শুনলেই কমজোরি হয়ে পড়ে।

"ব্লাড শুগার টেস্ট করাতে বলেছিল! টেস্টের রিপোর্টটা নিয়ে গেছলাম দেখাবার জন্য।"

"কি বললেন ডাক্তার?"

"ঘরে ছিল না, ওয়ার্ডে বেরিয়েছে। ওর টেবিলে রেখে দিয়ে এসেছি চিঠি লিখে।.....দুশো চব্বিশ পি পি। বেশি নয়, কি বলো?"

"কে বলল বেশি নয়? দুশো চব্বিশটা চারশো চব্বিশ হতে ক'দিন? খুব পাজি রোগ এই ডায়বিটিস। এর থেকে কত রকমের যে রোগ হতে পারে, অতুলদা আপনি জানেন না।"

কে বলল জানি না। প্রিয়ব্রত মুখে হাসি টেনে রেখে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইল ভৌমিকের দিকে। অতুল ঘোষ নামের এই লোকটাই তো একটা রোগ। ছাব্বিশ বছর ধরে মিথ্যের মধ্যে ডুবে থেকে মিথ্যা কথা বলাটা কেমন জল-ভাত করে ফেলেছে। অম্লান বদনে বলে ফেলল ডাক্তারের কাছে গেছলাম, ব্লাড শুগার টেস্টের রিপোর্ট নিয়ে।

"হার্ট ডিজিজ হতে পারে, হ্যাঁ।" ভৌমিক চাপা স্বরে খবরটা জানাল।

"আমিও তাই শুনেছি।"

"আমার মামাশ্বশুর মারা গেছেন হার্টের রোগে। ডায়বিটিস ছিল। আপনি খাওয়া-দাওয়ায় সাবধান হোন, চিনি একদম নয়। এখানে চায়ে বড্ড চিনি দেয়,

খাওয়া বন্ধ করুন। মাটির নীচে জন্মায় যেসব আনাজ, আলুটালু..... ।"

"খাই না। শাঁকালু, মুলো, পেঁয়াজ.... ।"

"জোরে জোরে রোজ মাইলখানেক হাঁটুন।"

"ভাবছি হেঁটেই বাড়ি ফিরব।"

"সকালে করোলার রস যদি....."

"আধ কাপ করে খাই।"

"এ রোগ তো কখনো সারে না, তবে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত করলে কন্ট্রোলে রাখা যায়।"

স্বদেশ আসছে। প্রিয়ব্রত তিন-চারটে ফাইল গোছা করে সামনে রেখে ফিতে খুলতে শুরু করল। ভৌমিকের মুখোমুখি স্বদেশ বসল। ঝুঁকে ফিসফিসিয়ে ভৌমিক কথা বলছে।

"সে কি.....কই দেখে তো মনে হয় না!"

স্বদেশ যত রাজ্যের হাঁড়ির খবর, গোপন ব্যাপার নাকি জানতে পারে অথচ এই খবরটারই হদিশ পায়নি। প্রিয়ব্রত মনে মনে হাসল। 'ডেঞ্জারাস লোক এই স্বদেশ সরকার।' সত্যিই কি খুব বিপজ্জনক? 'পৃথিবীতে কোন লোকের না গোপন ব্যাপার আছে বলুন? আমার আছে, আপনার আছে, অতুলদার'.....।

"সেক্সুয়াল পাওয়ার কমে যায়। হ্যাঁ, সত্যি। ডায়বিটিস বড় বাজে জিনিস....অবশ্য ওনার তো এ ব্যাপারে কোন সমস্যাই নেই।"

"কেন থাকবে না? বৌ না থাকা মানেই কি সেক্স না থাকা? এই বয়সটাই তো, মানে যৌবন চলে যাওয়ার সময়টাই তো.... ।"

প্রিয়ব্রতর কপালের দু'ধার দপদপ করে উঠল। স্বদেশ কি এখন একটা ডেঞ্জারাস জায়গায় চলে যাচ্ছে? এই রকম জায়গায় হিতুও পৌঁছে গেছল। 'নিঃসঙ্গ বোধ করছ....কম্প্যানিয়ন চাই?' ....'মা মারা যাবার পর তুমি তো বিয়ে করতে পারতে!'

হিতু হঠাৎ এ কথা বলল কেন?

বাবা কেন নিরুকে লোডশেডিংয়ের মধ্যে বাড়িতে নিয়ে এল? হিতুর মাথার মধ্যে এটাই প্রথমে গেঁথে গেছল। কিন্তু গাঁথল কেন? মাথাটা নিশ্চয় নরম হয়ে ছিল অনেক দিন ধরেই তাই ব্যাপারটা চট করে বসে যেতে পেরেছে। ও কি তাকে লক্ষ্য করত? কবে থেকে.....কৈশোরে পৌঁছবার সময় থেকেই কি বাবার সম্পর্কে এই ধরনের ভাবনা এসেছিল?

কিন্তু আমি তো প্রাণপণে হুঁশিয়ার থাকার চেষ্টা করেছি। কখনো তো হিতুর

উপস্থিতিতে ঘরের জানলায় পর্যন্ত দাঁড়াইনি, সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় অশোকবাবুর ঘরের দিকে তাকাইনি ! ঘরের কাজের জন্য মেয়েমানুষ রাখিনি কিন্তু রাখতে পারতাম। পাড়ার অনেক বাড়ির কর্তার সম্পর্কে তো ঝি-কে জড়িয়ে অনেক কথাই শোনা যায়। যাদের নিয়ে কথা হয়, তারা সেসব তো কখনো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনি। সেও আনত না। কিন্তু তবুও সে·····।

"আরে অতুলদা, আপনি তো দেখছি পরীক্ষার পড়ার মত ফাইলই পড়ে যাচ্ছেন। অত চিন্তা-ভাবনার কি আছে ? ডায়বিটিস তো কোটি কোটি লোকের আছে। আমার থাকতে পারে, ভৌমিকদারও থাকতে পারে। আমরা ব্লাড টেস্ট করাইনি তাই জানতে পারছি না, আপনি করিয়েছেন তাই ধরা পড়েছে।"

ধরা পড়েছে ? প্রিয়ব্রত ভ্রূ কোঁচকাল। কিছুর কি ইঙ্গিত দিল ?

"ধরা পড়ে তো ভালই হল। এবার রোগটাকে বাগে রাখতে যা যা করার দরকার করতে পারবেন।"

স্বদেশ কি ইঙ্গিতটা আরও স্পষ্ট করল ? গৌরাঙ্গর সঙ্গে কথা বলার জন্য ওরা ঘরের বাইরে গিয়ে অপেক্ষা করেছিল। গৌরাঙ্গর কাছ থেকে সবই জেনে নিয়েছে। নিশ্চয় আজ বা কালই ওরা স্টাফ সেকশানে গিয়ে তার সার্ভিস ফাইলটা দেখতে চাইবে। দেখানর নিয়ম নেই কিন্তু ওখানে ওদের লোক আছে। তারপর ইউনিয়নের দু-তিনজনের সঙ্গে ফিসফাস কথা হবে। 'অফিসে কখন যে কিসে ফেঁসে যাবেন আপনি তা জানেন না।'

জানব না কেন। আমি নিজেই তো নিজেকে ফাঁসিয়ে ফেলেছি। নিরু থানায় বসে বলল আমি ভীতু, কাপুরুষ।

"ভৌমিকও আমাকে তাই বলল। খাওয়া-দাওয়ায় সাবধান হতে হবে, জোরে জোরে মাইলখানেক হাঁটতে হবে, করোলার রস খেতে হবে।"

কিন্তু কেন ? একটা ভীরু, যে পালাতে চায় কিন্তু একা পালাবার সাহস নেই তাকে হার্ট ডিজিজ হওয়া থেকে মুক্ত রাখার কি কোন দরকার আছে ?

"আপনি কি সকালে ঘুম থেকে উঠে উইক্ ফিল করেন ?"

স্বদেশ কি প্যাঁচালো কোন নোংরা ইঙ্গিত করল ? সেক্স ? 'এই ঘরেই আমি থাকব, থাকতে ঠিক পারব।' নিরু কি ভেবে কথাটা বলেছিল ? কথাটা কি বাঁচতে চাওয়ার জন্য বেপরোয়া তাগিদে বলা, নাকি····বুঝতে আমিই ভুল করেছিলাম !

প্রিয়ব্রত জিজ্ঞাসু চোখে ভৌমিকের দিকে তাকাল। "কিছু বললে ?"

"হ্যাঁ। বলছি কি, আপনি মাসখানেকের ছুটি নিন, কখনো তো নিলেন না।

কত মাসের আরন লিভ নষ্ট করেছেন তার হিসেব রেখেছেন ?"

"না।"

"ন্যায্য পাওনা কড়ায় গণ্ডায় বুঝে না নেওয়া, এটাকে কি বলবেন ?" স্বদেশ তার হতাশা, অনুযোগ আর বিরক্তি একসঙ্গে প্রকাশ করতে চেয়ারে হেলান দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিল, মাথার পিছনে হাতের দুই তালু রাখল। চোখে ঈষৎ বিদ্রূপ এবং কাঠিন্য।

"এটা তো আপনার অর্জিত পাওনা, ভিক্ষে করে তো এই ছুটি নিচ্ছেন না ? দয়া করেও গভর্নমেণ্ট ছুটি দিচ্ছে না।....এই ধরনের গোলামির কোন মানে হয় না। ছুটি চাইলে কি ভেবেছেন গভর্নমেণ্ট চটে গিয়ে আপনার চাকরিটা খেয়ে নেবে ?

"না না....আসলে ছুটির কোন দরকার হয়নি, তাই।"

স্বদেশ কি বলতে চায় ? চাকরি যাবার ভয়ে এত বছর ধরে ছুটি নিইনি ! ভীরুতা ? প্রিয়ব্রত কানের উপরে গরম ছুঁচ ফোটাবার মত যন্ত্রণা বোধ করছে।

"কুড়ি-পঁচিশ বছর আপনার কখনো আরন লিভ নেবার দরকারই হয়নি !" ভৌমিক তাকাল প্রিয়ব্রতর দিকে নয়, স্বদেশের দোমড়ান ঠোঁটের দিকে।

"একইভাবে, তার মানে এত বছর কাটিয়ে এসেছেন !"

"হ্যাঁ।"

হিতু কি যেন বলেছিল ? 'একইভাবে চাকরি করে গেলে, একই চেয়ার টেবিলে বসে....আমি জ্ঞান হওয়া থেকে তোমায় দেখলুম শুধু গঙ্গাজলই খেয়ে গেলে, নিজেকে একটু ঝাঁকাঝাঁকিও করলে না।'

নিজেকে ঘিরে ছাব্বিশ বছর ধরে খোলস বানিয়ে সে তার মধ্যে নিজের একটা জগতে বাস করে যাচ্ছে। সেই জগতে যা কিছু স্পর্শ করেছে তাতেই ভয়, যা কিছু দেখেছে, শুনেছে তাতেই ভয়। শীতল অন্ধকার খোলসটার সঙ্গে কি চমৎকার সে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে ফেলেছে। কাউকে জানতে দেয়নি তার বসবাসের ঠিকানা। সেই খোলসটা এখন পাল্টে গিয়ে তাকে হুমকি দেওয়া, মারমুখী একটা বাইরের জগতে ঠেলে দিচ্ছে।

"অতুলদা আপনার কি একবারও ইচ্ছে করেনি দিঘা বা দার্জিলিং বেড়িয়ে আসতে ?"

"না।"

অতুল ঘোষের করেনি কিন্তু প্রিয়ব্রতর করে। 'আমার মনে হয়েছিল উনি পালাতে চান।' প্রিয়ব্রত এখনো বুঝে উঠতে পারেনি, নিরু বলল কেন তাকে

নিয়েই পালাতে চাই ? মেয়েদের কি ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম পর্যন্তও ইন্দ্রিয় আছে ! কোথায় পালাতে চাইব·····দিঘা, দার্জিলিং ?

ভৌমিক আর স্বদেশের মধ্যে যে চোখাচোখি হল, প্রিয়ব্রত না তাকিয়েই সেটা বুঝে নিল। ওরা আর তার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ দেখাল না। একটু পরেই স্বদেশ উঠে চলে গেল।

"ভৌমিক, আমি বরং একবার ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করে আসি।" প্রিয়ব্রত উঠে দাঁড়াল। অসহ্য লাগছে তার এই পরিবেশ। এই চেয়ার টেবিল ফাইল, আধা অন্ধকারে আলো জ্বালিয়ে মাথা নিচু করে কাজ। ভৌমিকের চোরা চাহনি। তার এখন একটু বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে।

"এখন কি তাকে পাবেন ?"

"দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত থাকে। যাব আর আসব, কেউ খোঁজ করলে বলে দিও নীলরতনে গেছি একটু দরকারে।"

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দোতলায় ডিরেক্টরের ঘরের দরজায় পাপোষটার দিকে প্রিয়ব্রত তাকাল। মাঝখানটা ক্ষয়ে গিয়ে মসৃণ। কত বছর বয়স হল পাপোষটার ! দেয়ালে চার দফা দাবীর পোস্টার। তার নীচে পুরনো একটা মিটিংয়ের পোস্টার। তারও নীচে আর একটার ছেঁড়া কোণ দেখা যাচ্ছে। পরতে পরতে দাবীর, মিটিংয়ের এই খোলসটা কত যত্নে লড়াই করে এরা বাঁচিয়ে চলেছে। যেদিন ওটা ভেঙ্গে যাবে····। সুখেন্দু বেঞ্চে পা তুলে বসে। তাকে দেখে পা নামাল। প্রিয়ব্রত না দেখার ভাণ করল।

সারা বাড়িটায় গুনগুন একটানা আওয়াজ। নিজের চেয়ারে বসে কখনো সেটা কানে লাগেনি। রাস্তায় বেরিয়ে এসে প্রিয়ব্রত মুখ তুলে তার অফিস বাড়িটাকে দেখল। দেখতে দেখতে তার মনে হল, অতি সাধারণ একটা পুরনো বাড়ি। এর মধ্যে যে একটা সরকারী দপ্তর, তাতে শ দুয়েক লোক কাজ করছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে না। এই বাড়িতে প্রতিদিনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সে জমা দিয়ে গেছে। বিনিময়ে পেয়েছে জীবনধারণের জন্য কিছু টাকা। কোন সম্পর্ক সে বাড়িটার সঙ্গে খুঁজে পেল না।

রাস্তা দিয়ে আপনমনে অভ্যাসমত হেঁটে সে মৌলালির মোড়ে এসে থমকে গেল। ছুটি হয়ে গেছে নাকি। যাচ্ছি কোথায় ? কেন এখন বেরোলাম অফিস থেকে ?

দ্রুত ধাবমান ট্রেনের আলোর মত প্রিয়ব্রতর চেতনার উপর দিয়ে পিছলে গেল প্রশ্নগুলো। চটকা ভাঙ্গা চোখে তাকিয়ে দেখল সে একটা লেদ মেসিনের

দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। এই দোকানটার সিঁড়িতেই তো সে বৃষ্টির সময় সেদিন উঠে দাঁড়িয়েছিল!

তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে সে রাস্তা পার হবার জন্য পেভমেন্টের কিনারে দাঁড়াল। খুদিকেলো বা নিরুর সঙ্গে আর তার দেখা হবে কি না সে জানে না বা দেখা হলেও তারা নিশ্চয় আর কথা বলবে না। কিন্তু স্মৃতি তাকে তাড়া করবে।

প্রিয়ব্রত রাস্তা পার হল। এখন তাকে কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে অফিসে ফিরতে হবে। আবার ওই ভৌমিকের চোরা চাহনি আর সজাগ কানের আওতায় গিয়ে বসতে হবে। আবার স্বদেশ এসে সবজান্তা মাতব্বরি চালে তাকে উপদেশ দেবে। 'ডেঞ্জারাস লোক', সবার হাঁড়ির খবর রাখে, কে বয়স কমিয়ে চাকরি করছে তাও হয়তো জানে! কে নাম ভাঁড়িয়ে অন্য লোকের নামে চাকরি করছে, সেটা জানতে ওর ক'দিন সময় লাগবে?

গৌরাঙ্গ কবে আসবে, সেটা কি যাবার সময় বলে গেছে? আজও আসতে পারে, নয়তো কাল। 'বাবা বলে গেছেন ততদিনই আপনি দেবেন।' ততদিন মানে রিটায়ার না করা পর্যন্ত। কথাগুলো বলার সময় গৌরাঙ্গর মাথার চুল মশার মত ভনভন করে উঠেছিল। চোখের পাতা উঠে গিয়ে মণিদুটো অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেছল। শেষ পর্যন্ত বিনয় দেখিয়ে যাবে। দিনের পর দিন আসবে আর তাকে কোণঠাসা করবে ধীর নম্র ভঙ্গিতে। শুধু মনে করিয়ে যাবে, মাসকাবারিটা দিয়ে দিলে 'আপনার মঙ্গলই হবে।' থমকে দাঁড়িয়ে প্রিয়ব্রত স্টপে এসে দাঁড়ান বাসটার দিকে তাকাল।

ভিতরে ঠাসাঠাসি যাত্রীরা। লোক যত নামল ততজনই প্রায় উঠল। লেডিজ সিটের সামনেও এক হাত তুলে রড ধরে দাঁড়িয়ে মেয়েরা। শাঁখাপরা হাতে থলি আঁকড়ে দাঁড়ান বৌটিব মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়ব্রতর মনে হল, ওর দু চোখে চাপা বিরক্তি। মুখটা ঘুরিয়ে পিছনের লোককে কিছু বলল। বাস ছেড়ে দিয়েছে। যতদূর সম্ভব সে বৌটিকে দেখার চেষ্টা করল। রাগতমুখে কথা বলে যাচ্ছে। এই ভিড় বাসে ওর পিছনে দাঁড়ান পুরুষমানুষটি কি বাঁ উরু দিয়ে পাছায় চাপ দিয়েছে?

কিন্তু আমি তো নই, নিরুই স্বেচ্ছায় করেছিল। বাসের দোলানি আর ঝাঁকানিতে চাপটা এক-এক সময় শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। প্রিয়ব্রত তখন ধাঁধায় পড়ে গেছল। তার খোলসে এমনভাবে আঘাত আসতে পারে সে ভাবেনি। সত্যিই সে ভয় পেয়ে নিজের জগতটাকে রক্ষা করার জন্য আরো কঠিন হয়ে যায়। 'হয় না হয় না, তুমি এখনো ছেলেমানুষ, ঠিক বুঝবে না

অসুবিধেটা কোথায়……এখন বাড়ি চলো।' অসুবিধেটা কি ছিল ? এইসময়েই তো জীবনটাকে মদের মত চুমুকে চুমুকে খাওয়ার কথা।

একটা বড় রকমের ভুল সে করে ফেলেছে। জীবনে আর এমন সুযোগ হয়তো আসবে না ! নিরু তাকে জড়িয়ে ধরে থাকতে চেয়েছিল। এটাই সে বুঝতে পারেনি। হিতু বলেছিল, কেউ কি ওকে বিয়ে করতে রাজি হবে ?…'তোমাকে বললে কি— ?' একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত…বাবাকে জীবন উপভোগ করিয়ে দেবার জন্য ছেলের চেষ্টা ! হিতু নিশ্চয় তাকে লক্ষ্য করেছে যেমন বিশ্বজিত গুপ্তাকে সিডনি থেকে নজরে রেখেছিল জন ট্যালেন্ট। নিজের সাহস নেই তাই ছেলে সাহস যুগিয়ে দিতে এগিয়ে এসেছে।…ভিতু।

প্রিয়ব্রত উদভ্রান্তের মত এধার ওধার তাকিয়ে মাথা নিচু করে এবং ট্র্যাফিক উপেক্ষা করে বিপজ্জনকভাবে রাস্তা পার হল। চা খেয়ে ছুঁড়ে দেওয়া মাটির ভাঁড়টা তার দু হাত সামনে পড়ে চৌচির হয়ে গেল। প্রিয়ব্রত মুখ ফিরিয়ে তাকাতেই লোকটি কাঁচুমাচু মুখে অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলল।

ফণী পাল থাকলে ছড়িটার ডগা দিয়ে টুকরোগুলো সরিয়ে দিত। ফণী পাল নিজেই সরে গেছে। কিন্তু তার বদলে রেখে গেছে ঝুলি কাঁধে একজনকে। গৌরাঙ্গ আজ হয়তো আবার আসবে। ভৌমিক কান উঁচিয়ে কথা শোনার চেষ্টা করবে। সে ঘড়ি দেখবে আর ড্রয়ার টেনে সাদা খামটার দিকে তাকাবে। কুড়ি বছর ধরে ফণী পাল, পাঞ্জাবির বোতাম খুলে, খামটা ভাঁজ করে দুবারের চেষ্টায় ভিতরের পকেটে ঢোকায়। গৌরাঙ্গ কি সেইভাবেই বাবাকে অনুসরণ করবে ? ওর খদ্দরের পাঞ্জাবিটায় কি ভিতরের পকেট আছে !

সারা অফিস একইভাবে গুণগুণিয়ে যাচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় দোতলার ল্যাণ্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে সে ডিরেক্টরের ঘরের দিকে তাকাল। পর্দাটা শান্তভাবে ঝুলছে। পর্দার তলা দিয়ে একজোড়া জুতো দেখা যাচ্ছে। কেউ দাঁড়িয়ে কথা বলছে : কার পা ? জুতোদুটো অনেকটা তারই জুতোর মত। সে ওইখানে দাঁড়িয়ে ডিরেক্টরের মুখের দিকে তাকিয়ে কখনো কিছু কি বলেছে ?

শ্যামসুন্দরের ক্যান্টিনের সামনে চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে ঘুগনি আর সেঁকা পাঁউরুটি খাচ্ছে। প্রিয়ব্রতকে দেখে দেখে ব্যস্ত শ্যামসুন্দর চেঁচিয়ে বাচ্চাটাকে বলল, "অতুলবাবুকে চা দে।"

"না, চিনি দেওয়া চা আর খাব না।"

"চিনি ছেড়ে দিলেন !"

"হ্যাঁ।"

"খুব ভাল করেছেন·····ওরে চিনি ছাড়া এক কাপ বাবুকে করে দে।"

প্রিয়ব্রত সরে গিয়ে বারান্দার কাছে দাঁড়াল। রোদের হলকায় বাইরের দিকে তাকান যাচ্ছে না অথচ সে এতক্ষণ রাস্তায় হেঁটে বিন্দুমাত্র গরম বোধ করেনি। হাওয়ায় ঘামে ভেজা ঘাড়ের কাছে ঠাণ্ডা লাগছে। গেঞ্জিটা সেঁটে রয়েছে চামড়ার সঙ্গে। আজও মেঘ নেই কিন্তু হঠাৎই বিকেলের দিকে আকাশ কালো করে এসে যায়।

চায়ের কাপ বাচ্চাটার হাত থেকে নিয়ে সে প্রথম চুমুক দিয়েই অদ্ভুত অপরিচিত স্বাদ পেল। কষা পাঁচনের মত। ছোটবেলায় ম্যালেরিয়া হতে জ্যাঠামশাই কোবরেজমশায়ের কাছে নিয়ে গেছলেন। পেটে চারটে আঙুল দিয়ে খোঁচাখুচি করে পীলের অবস্থা পরীক্ষা করে পাঁচন আর কি একটা বড়ি আনারস পাতার রস দিয়ে—

"অতুলদা আপনি এখানে ?" ভৌমিক দোতলা থেকে উঠে এসে, তাকে দেখে এগিয়ে এল। "আপনার একটা ফোন এসেছিল সজল দত্তের কাছে। আমি উঠে গিয়ে কথা বললাম।"

"ফোন! আমার!" প্রিয়ব্রতর বুকের মধ্যে বরফ জমে উঠল। ছাব্বিশ বছর চাকরিতে এই প্রথম। নিশ্চয় খারাপ খবর।

"কে করেছিল ? কি জন্য ? কি বলল ?"

"আপনার ছেলে।"

"হিতু! কি হয়েছে ওর ?"

মোটরবাইক অ্যাকসিডেন্ট! ঝলকের জন্য তার চোখে ভেসে উঠল দলাপাকান রক্তাক্ত হিতু।

"একটা খবর আপনাকে জানিয়ে দিতে বলল। নিরু নামে একটি মেয়ে, আজ এগারোটার সময় কলঘরে গায়ে আগুন লাগিয়েছে। হাসপাতালে পাঠান হয়েছে, সম্ভবত বাঁচবে না।"

প্রিয়ব্রত একদৃষ্টে তাকিয়ে ভৌমিকের মুখের দিকে। মুখের পেশী অচঞ্চল। দাঁড়ানর ভঙ্গিতেও কোন পরিবর্তন ঘটল না। ভৌমিক আশ্বস্ত স্বরে বলল, "আত্মীয়টাত্মীয় নয়।"

"না।" প্রিয়ব্রত চুমুক দেবার জন্য কাপটা তুলে আবার নামাল। "পিছনের বাড়ির একটা মেয়ে।"

"প্রেমঘটিত ?"

"না।"

"তাহলে আর কিসের জন্য ?"

জবাব না দিয়ে প্রিয়ব্রত এগিয়ে গেল। শ্যামসুন্দরের টেবিলে আধখাওয়া চায়ের কাপ রেখে অফিস ঘরের দিকে যেতে যেতে গলা নামিয়ে ভৌমিককে বলল, "খুনও তো হতে পারে।"

নিজের চেয়ারে বসে প্রিয়ব্রত মাথা নিচু করে একদৃষ্টে টেবিলে রাখা ফাইলের দিকে তাকিয়ে রইল। কানের পাশে যন্ত্রণাটা আবার শুরু হয়েছে। ভিজে গেঞ্জি শুখিয়ে চামড়া টেনে ধরছে। সে ড্রয়ারে চাবি ঘুরিয়ে টেনে খুলল। উপরেই রয়েছে সাদা খামটা। নিরাসক্ত চোখে সে খামটার দিকে তাকিয়ে রইল।.....কিন্তু কেন ? কেউ ওকে খুন করবে, কি উদ্দেশ্যে, মোটিভ কি ? বীতশ্রদ্ধ হয়ে, ঘেন্নায় কি নিরু চলে যেতে চেয়েছে ! ভীতু, কাপুরুষ লোকগুলোই কি ওকে.....কাপুরুষ একটা লোকই কি..... ।

কিছুক্ষণ পর সে খামটা তুলে ভিতর থেকে একশো টাকার পাঁচটা নোট বার করে পকেটে রাখল। তারপর শান্ত হাতে একটা সাদা কাগজ টেনে নিয়ে ডান হাতটা ড্রয়ারে ঢুকিয়ে কলম তুলে নিল।.....নিরুর তো আত্মহত্যা করার কথা নয়।...'প্রাণের মায়া তো সবারই আছে, তাই না ?' ও তো তাই বলেছিল।

এইবার সে মন দিয়ে তার কাজটা শেষ করে ফেলতে চায়। এখন সে কোনদিকে তাকাবে না। কোন কথা কানে ঢোকাবে না। তার ইন্দ্রিয়ের সবকটা দরজা বন্ধ করে দিয়ে সে কাজ করবে। ছাব্বিশ বছরের জমানো কাজ সে আজই শেষ করবে। মুখ ফিরিয়ে দরজা দিয়ে তাকিয়ে, শেষবারের মত আকাশটা যেন দেখে নিয়ে প্রিয়ব্রত শুরু করল : "মাননীয় ডিরেক্টর মহাশয়—

অফিস ছুটির আধঘণ্টা আগে সে দরজার কাছে গৌরাঙ্গকে দেখতে পেল। মুখে সরল, অপ্রতিভ হাসি নিয়ে ঘরের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে আসছে। প্রিয়ব্রতর মুখের পেশী সামান্য নড়ে উঠল। ভৌমিক একবার চোখ তুলে দেখল।

"কেমন আছেন ?"

"ভাল...খুব ভাল।" প্রিয়ব্রত হাতের কাজ বন্ধ করল। ঘড়ির দিকে তাকাল।

"একটু দেরী হয়ে গেল আসতে। বাস ট্রামের যা অবস্থা !"

"হ্যাঁ, খুবই অসুবিধা হয়।"

গৌরাঙ্গ বোধহয় আশা করেনি প্রিয়ব্রতকে এমন সমাহিত ধীর দেখবে। ঝুলে পড়া চোখের পাতার তলা থেকে নজর বার করে আনার চেষ্টায় তার কপালে ভাঁজ পড়ল।

"ইতিমধ্যে আপনি কিছু কি ভাবলেন ?" গৌরাঙ্গ গলা নামিয়ে বলল।
"হ্যাঁ ভেবেছি।"

তার কথার প্রতিক্রিয়া গৌরাঙ্গর মুখে দেখার জন্য সে তাকাল না। সাদা খামটা দুআঙুলে শুধু তুলে নিল ! সে আন্দাজ করতে পারছে এই খামটা দেখে ওর মনের মধ্যে কি ঘটছে।

প্রিয়ব্রত ঘরের সর্বত্র তাকাল। শেষবারের মত সে যেন ছবি তুলে নিচ্ছে তার ছাব্বিশ বছরকে স্মৃতির অ্যালবামে রাখার জন্য।

"আপনি বসুন, আমি আসছি।"

প্রিয়ব্রত সাদা খামটা হাতে নিয়ে উঠল। মন্থর গতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় এল। ডিরেক্টরের ঘরের দরজার পাশে বেঞ্চে বসে সুখেন্দু। তার পাশে বসে একটি যুবক ভিজিটিং স্লিপে নাম লিখছে।

"সুখেন্দু এই চিঠিটা সাহেবকে দিয়ে এস।"

"ভেতরে অ্যাকাউন্টসের দীপকবাবু খুব আরজেন্ট চিঠি কি ?"

"ন আ আ।"

প্রিয়ব্রত ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসল। গৌরাঙ্গ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে। এতক্ষণে নিশ্চয় চিঠিটা পড়া হয়ে গেছে। মাত্র এগারোটা লাইন। পড়েই চমকে উঠবেন। বেল বাজাবেন। সুখেন্দু ঘরে ঢোকামাত্র বলবেন…।

"হ্যাঁ, আমি ভেবেছি। আমি যে একটা মানুষ এটা বুঝে ওঠার মতো কোন ব্যাপারই এতকাল আমি পাচ্ছিলাম না…ভুল করে ফেললে সেটা শুধরে নেওয়া উচিত, মানুষে তাই করে। আপনি যদি না আসতেন তাহলে আমি জানতেই পারতাম না, ছাব্বিশ বছর ধরে আমি শুধু ছাইগাদার দিকেই হেঁটেছি।"

প্রিয়ব্রত কৌতুক বোধ করল গৌরাঙ্গর মুখে বিভ্রান্ত ভাব দেখে, বেচারা, বিরাট আশা নিয়ে এসেছে।

"আমার মত অবস্থায় পড়লে আপনি কি করতেন ?…মাসে মাসে টাকাটা দিয়ে দিতেন। আমি তাইই করেছি। কিন্তু আর নয়।"

প্রিয়ব্রত দেখতে পেল সুখেন্দু ব্যস্ত হয়ে আসছে। এবার তাকে দোতলায় যেতে হবে। সে চেয়ার থেকে উঠল। সুখেন্দু দূর থেকেই হাত নেড়ে ইসারায় তাকে দোতলায় যাবার ইঙ্গিত করল।

তার কথা এখনো শেষ হয়নি। ডিরেক্টরের ঘরের পর্দা সরাবার আগে তার মনে পড়ল, তিনকড়ি কেন জায়গা বদলে বসতে চেয়েছিল এখনো সেটা জানা

হয়নি ! এরপর তার চোখে হিতুর মুখটা একবার ভেসে উঠল। আর মনে মনে শুনতে পেল : 'তোমার ওই বন্ধুটা বিপজ্জনক লোক।'

তখনো ওনার হাতে চিঠিটা। বোধহয় তৃতীয় কি চতুর্থবার পড়ছেন। টেবিলে পড়ে রয়েছে সাদা খামটা। সোনালি ফ্রেমের চশমাটা খুলে চোখ কুঁচকে তাকালেন।

"এসব কি লিখেছেন···বিশ্বাসই করতে পারছি না।"

"স্যার কয়েক মিনিট সময় দিন, আমি সব বুঝিয়ে বলছি।"